একুশ শতকী রেনেসাঁস, গ্রাম ও গ্রামবাসী

রেনেসাঁস বা নবজাগরণের মূলে কাজ করে সমন্বয়। মূলত অতীতের সঙ্গে বর্তমানের। সাময়িক নানা বিরোধ ও বৈপরীত্যের মধ্যে সমন্বয়ও রেনেসাঁসের অন্যতম প্রাণধর্ম। এদেশের উনিশ শতকী রেনেসাঁসে দুই ধরনের সমন্বয়ই ঘটেছিল কিছু পরিমাণে। অতীতের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তথাকথিত উচ্চ-নীচের বা হিন্দু মুসলমান-খ্রীস্টানের সমন্বয়-সম্ভাবনা উনিশ শতকে উচ্চকিত করে তুলেছিল বলেই বাঙালি সমাজে নবজাগরণের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এও সত্যি, এই জাগরণের ক্ষেত্রে একটা অন্ধকার এলাকা ছিল। সে হল তার শহর-সর্বস্বতা। এর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ইংরেজ এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলিম সমাজের দীর্ঘায়িত দ্বিধা। ফলে শহরে-গ্রামে যেমন বিভক্ত হয়েছে দেশ, তেমনি, শহরের মধ্যেও বৈষম্য তৈরি হয়েছে শিক্ষার প্রকৃতি বৈষম্যকে ঘিরে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইংরেজের পক্ষপাত-জনিত দোষ। রাজত্বের সূচনাকালে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রতি এবং অন্ত্যকালে মুসলিমদের প্রতি ইংরেজরা যে পক্ষপাতিত্বের চর্চা করেছিল, তা তাদের সাময়িক স্বার্থসিদ্ধি ঘটালেও তার ফলে গোষ্ঠীবিশেষের বা দেশের সামগ্রিক কী কল্যাণ হয়েছে, তা ভেবে দেখবারই যোগ্য।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বৈষম্য ও বিভেদ অপ্রতিহত থেকেছে। বঙ্গদেশ দ্বিখন্ডিত হওয়ার পরেও আরও খন্ড খন্ড হতে চাইছে। বিশ্বায়িত সম্পর্ক-সৃষ্টির যুগে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে এই সম্পর্কচ্ছেদের চেষ্টা ভাসা-ভাসা দৃষ্টিতে দেখবার যোগ্য নয় মোটেই। ধর্মের পাশাপাশি বর্ণ, জাতি, ভাষা, শ্রেণী, দল-ভেদে বিচিত্র 'আমরা-তোমরা'র মধ্যে পিছলে চলেছে সমস্যা। সম্প্রীতির শক্তিকে আমরা সমবায়িত করতে অভ্যস্ত হলাম না বলেই বিদ্বেষ ও বিচ্ছেদের শক্তি এমন বেপরোয়া হয়ে উঠলো কিনা, তাও ভেবে দেখবার বিষয়। 'আমরা-তোমরা'র মধ্যে একটাকে ছেড়ে অন্যটাকে ধরে, অথবা অধিকতর মন্দের থেকে অপেক্ষাকৃত কম-মন্দের মধ্যেই এতাবৎ স্বস্তি খুঁজছে আমাদের ভীরু মন। 'দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন'-কে আহরণ করতে প্রয়োজন যে সাহসী আশার, তা যেন আমাদের পরিত্যাগ করে গেল। মানব ও প্রকৃতি-কেন্দ্রিক নানামুখী মহা-সম্বন্ধের অসীম সম্ভাবনা সম্পর্কে স্বপ্ন দেখবার শক্তিও আমরা হারালাম করুণভাবে। নিছক বুদ্ধি-আশ্রয়ী বৈজ্ঞানিক কৃৎকৌশলই আমাদের তারণের একমাত্র পথ হল, একমাত্র আশ্রয় হল বাজারবাদী সংস্কৃতি। এই বিশ্বায়নের যুগে দেখলাম, এই বুদ্ধিসর্বস্ব বাজারবাদ প্রকৃতি তথা প্রাণের ওপর যে হৃদয়হীন প্রভাব বিস্তার করেছে, তার মতো বিপর্যয়কর ঘটনা জানিত-কালের ইতিহাসে আর নেই। ঐ বাজারবাদেরই একান্ত আত্মজ হলেও, দুই বিশ্বযুদ্ধ ক্ষতিকরতার দিক থেকে তুলনায় শিশু।

এই হৃদয়হীন বাজারবাদ বুদ্ধিসর্বস্বতাকে এতখানি অগ্রাধিকার দিয়েছে যে, তার ফলে বিশ্বের সম্পদ স্বল্পতম 'বুদ্ধিমান' ব্যক্তির হাতে ক্রমশ অতি-পুঞ্জিত হয়ে চলেছে। বিপুলতর সংখ্যায় মানুষ কেবলই হয়ে চলেছে প্রান্তবর্তী, পরিত্যক্ত। এই মানুষেরা অন্য বুদ্ধিসর্বস্ব মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে, অথবা নিজেরাই হতবুদ্ধি হয়ে, ঐ সর্বাত্মক বাজারবাদের প্রত্যুত্তর দিচ্ছে যে ভাষায়, তার নাম সন্ত্রাস। এই সন্ত্রাস কখনো বিকট বিস্ফোরণে

আকস্মিকভাবে বাঙ্ময়, হাড়-হিম-করা নৈঃশব্দেও বীভৎস কখনও-বা। মন্থনের ফলে দই যেমন কেটে গিয়ে পরস্পর বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়, বিশ্বব্যাপী মহামন্থনের ফলে বিশ্বায়িত যোগাযোগের কালেও অ-যোগ বা ফাঁকগুলোই উগ্র হয়ে উঠল। দেখা গেল, অ-দৃষ্টের এ এক আশ্চর্য পরিহাস!

এই প্রকার বাজারবাদের বিরুদ্ধে অসহায় বিষোদ্গার কোনো যথার্থ উত্তর হতে পারে না। ঐ ফাঁকগুলো সৃষ্টি হয়েছে এবং বৃদ্ধি পেয়েছে যেমন সুনির্দিষ্ট কারণে, তার নিরসনেরও তেমনি নির্দিষ্ট নানা উপায় থাকাই সম্ভব। সে কাজ শুরু হতেও পারে নানা দিক থেকে — আন্তর্জাতিক, জাতীয় বা নিতান্ত স্থানীয় বিন্দু থেকে। পরস্পর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে কখনও, কখনও-বা পরস্পর পরিপূরক হয়ে। সে কাজের লক্ষ্যও হতে পারে নানা মেয়াদি — স্বল্প, মধ্য বা দীর্ঘ।

একটি শুভ উদ্যোগ

পশ্চিমবঙ্গে 'অল বেঙ্গল কম্যুনাল হারমনি কমিটি' ধর্মগোষ্ঠীগত সমন্বয়ের কাজ শুরু করেছে এরকমভাবে। ২৬ ও ৩১ অক্টোবর ২০০৮, এই কমিটির আয়োজিত দুটি সভায় হাজির হবার সুযোগ আমার হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির লক্ষ্যে কমিটির চেষ্টা দেখে আরও কিছু করবার আছে বলে মনে হয়েছে আমার।

এই কমিটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মেলা-মেশার একটি সহজ সুযোগ করে দিয়েছে। সহজ বলছি এই জন্যে যে, বেছে বেছে ভালো ভালো কথাগুলিই কৃত্রিম প্রীতির সঙ্গে মিশিয়ে মিশিয়ে পরিবেশন করা এঁদের উদ্দেশ্য নয়। কথাগুলি খোলামেলা এবং আন্তরিক। তার মধ্যে বেদনার কথাও আছে, আনন্দের কথাও আছে। সব মিলিয়ে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির একটা পূর্ণতার ছবি যেমন পাওয়া যায়, তার থেকে পরিত্রাণের, আংশিক হলেও দিশাও পাওয়া যায়।

কমিটি ধর্মসম্প্রদায়গত ভেদের মধ্যেও সামঞ্জস্যের দিকটাকেই জোর দিচ্ছে, কাল্পনিক অভেদের তত্ত্ব এনে একটা অর্থহীন বৃন্দগানে ব্যাপৃত হচ্ছে না, এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক। আমাদের মধ্যে যাঁরা উদার সহিষ্ণু এবং সকরুণ, তাঁরা অনেক সময়ই আবেগ-তাড়িত হয়ে ধর্মে-ধর্মে মিলের দিকটাতেই জোর দিয়ে ফেলেন বেশি। যেখানে পার্থক্য সেখানে কী বলবেন? পারস্পরিক সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধা সেখানেও অগ্রসর হবে না কি? একের মধ্যে ঐক্যের দরকার হয় না, দরকার হয় বৈচিত্র্যের মধ্যেই। সেই জন্য সাম্প্রদায়িক সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে দেখতে হবে — আমরা একাকার তত্ত্বকে মানি, না, ঐক্যের তত্ত্বকে। কারণ, ঐক্যের পথেই পার্থক্যের উগ্রতা ক্রমশঃ প্রশমিত হয়। কিন্তু সব বৈচিত্র্যকে এক আকার পেতেই হবে — এই প্রত্যাশার মধ্যে আছে আগ্রাসিতা। তা ভেদকেই আরও উগ্র করে তোলে।

মহাবোধি সোসাইটি হলে সভার মূল বক্তা ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অরুণ মুখোপাধ্যায়। তিনি পার্থক্যের বিষয়টিকে যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করলেন। কিন্তু সহিষ্ণুতার

কথাটিতে এসে অস্বস্তিমুক্ত হতে পারছিলেন না সহজে। খুঁজছিলেন 'সম্প্রীতি' শব্দটিকেই সম্ভবত। সহিষ্ণুতা সম্প্রীতিকে জন্ম দেয়, না, সম্প্রীতি সহিষ্ণুতাকে? না, উভয়ই সত্য?

যাইহোক, পরিব্যাপ্ত প্রীতির কথাটা, অকারণ করুণার কথাটা, সভা দুটিতেই তেমন গুরুত্ব পেল না। বোধহয় এক অবসন্ন সময়কালে অকারণ আনন্দের প্রয়োজনটায় জোর দেবার মতো অবস্থা আমাদের নেই। আমরা ছোট ছোট কাজের কথাই ভালো করে জানি, তার প্রয়োজনটাই একান্ত বলে মানি। তাই বিপদ ঘনিয়ে উঠলে তক্ষুনি কী করতে হবে — এই ভাবনাতেই আমাদের মন আবিষ্ট হয়ে যায় বেশি। তাই শুধু বিপদ ঘনিয়ে উঠলে নয়, ঘনিয়ে ওঠবার আগেও কী করতে হবে সে ব্যাপারে কয়েকটি নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব রাখলেন ড. মীরাতুন নাহার, দ্বিতীয় দিনের ঘরোয়া সভায়। তাতে বিপদের মাত্রা কমবে এমন আশা করাই যায়। আয়েশা খাতুনের সূত্র ধরে তিনি বললেন, বিশেষত বিদ্যালয় স্তরে পাঠ্যসূচীর মধ্যে বিদ্বেষ বা অসহিষ্ণুতা সৃষ্টিকর বিষয়গুলো চিহ্নিত করে সেগুলি দূর করবার কথা। বললেন, শিক্ষক-শিক্ষণের ক্ষেত্রেও অধিকতর সংবেদনশীল হওয়ার কথা এবং সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণের কথা।

বিপদের কথা বার বার ওঠে, উঠছে। কিন্তু বিপদটা ঠিক কী, আমরা তা সব সময় ভাবি না। তার নাম দিই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সাম্প্রদায়িক মানে কী? কেবল ধর্মীয় সম্প্রদায়ঘটিত? আয়েষা ধর্মের ভূমিকার কথাকে খারিজ করে দিয়ে ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের এ্যাটিচ্যুড বা মনোভাবকেই দায়ী করেন। আয়েশার কথা শুনে বেশ বোঝা যায়, সন্নিহিত সমাজের স্থূলতার দ্বারা তাঁর মতো সংবেদনশীল মানুষ বেশ আহত। তবু এটাই লক্ষ করবার যে, তাঁর বিচারবুদ্ধি ধর্মবিশেষকে দোষী করে নি। নিরাসক্ত থাকতে পেরেছে।

প্রশ্ন হল, মনোভাবই দোষী? আর কিছু নয়? প্রথম দিনের সভার সভাপতি তরুণ সান্যাল, বিশেষ অতিথি কেশওয়ার জাহান এবং দ্বিতীয় দিনের অন্যতম বক্তা *ঝড়* পত্রিকার অচিন্ত্য সিংহ — সকলের কথাতেই উঠে এল এক দোষীর কথা এবং তা হল দলীয় রাজনীতি, ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে ন্যায়-নীতির চূড়ান্ত বিসর্জনেও যে অনীহ নয়। সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে যদি দলের শক্তি বৃদ্ধি হয়, তাহলে দল আজকে নরকে যেতেও রাজী।

এই দল ও দলতন্ত্র সর্বত্র উপস্থিত এবং প্রায় ভগবানের মতোই সর্বশক্তিমান। আলোচকগণ সাম্প্রদায়িকতা তথা দলীয়তার এই সমস্যাটাকে প্রগাঢ় গভীরতায় তুলে ধরেছেন। তবে বলা প্রয়োজন যে, সেই গভীরতায় তার সমাধানের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নি। সাম্প্রদায়িকতার জনক না হলেও পালক যদি হয় দল-তান্ত্রিকতা, তাহলে এই সর্বশক্তিমান পালকের মোকাবিলার কথাটাও অপরিসীম গুরুত্ব পেয়ে যায়।

আগেই বলেছি, উপস্থিত সমস্যার মোকাবিলার কথাকে উদ্যোক্তারা অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার গোড়া ধরে টান দেওয়ার মতো দীর্ঘমেয়াদী বা দূরগত কাজের প্রতি তাঁরা দৃষ্টি দিতে পারেন নি তেমন করে। তবে আশা করা যায়, ক্রমশঃ তাঁরা মেলাতে সচেষ্ট হবেন নিকটের সঙ্গে দূরকে। স্বল্প-মেয়াদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রমকেও।

বিরোধের ক্ষেত্র

মিলনের সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে বিরোধের ক্ষেত্রটিকে চিনে নিতে হবে একটু ভালো করে। মানুষের চিরন্তন স্বভাবের মধ্যেই আছে গোষ্ঠীবদ্ধতার প্রতি অনুরাগ। বিবিধ বৈচিত্র্যকে নিয়ে মোটের ওপর একটা সমাজ-সংহতিতে পৌঁছবার আগে মানুষ ছিল গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতেই বিভক্ত। আদিম যাযাবর জীবনে সেটাই ছিল টিকে থাকার পথ। পশু-পাখিরাও ছিল গুচ্ছে গুচ্ছে দলে দলে বদ্ধ। আজও তাই। তাই আমরা বলি, — হাতির দল, ভেড়ার পাল, পাখির ঝাঁক। ডাকাতের দল নাম নিয়ে সেই আদিম গোষ্ঠীবদ্ধতার অন্যতম অবশেষ টিকে আছে আজও। ধর্ম বা বর্ণকে নিয়ে যে গোষ্ঠীবদ্ধাতা, তার প্রকৃতি কিছুটা ভিন্ন। অন্তত হাজার হাজার বছর ধরে ভিন্নই ছিল কিছুটা। শাসক এবং পুরোহিতশ্রেণীর আধিপত্যবাদ তার দ্বারা আশ্রিত হলেও, আদিম গোষ্ঠীবদ্ধতা থেকে উঠে সভ্যতা যখন শুভ সমাজ-সাধনার পথে অগ্রসর হল, ধর্ম তখনকারই ভাষা। এক কথায়, সমাজ-প্রধান সভ্যতার ভাষা। ইউরোপীয় সভ্যতার হাত ধরে রাষ্ট্রপ্রধান সভ্যতার আদর্শ যখন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, তারই আচার-আচরণ আদর্শ প্রকরণ নিয়ে হাজির হলো দলতন্ত্র। সভ্যতার দুই পর্বের কিংবা একই পর্বে উপস্থিত দুই রুচি বা মেজাজের মিল এবং অমিল দুই-ই বর্তমান। ভালো ও মন্দের মিশ্র উপস্থিতি সেখানে।

উভয়ের মিল ও অমিলের লম্বা তালিকার কোনো প্রয়োজন নেই এখানে। কিন্তু দুই ধরনের সভ্যতার মূল কেন্দ্রকের পার্থক্যটা আমাদের বিশেষ করে মনে রাখতে হবে। সমাজ-প্রধান সভ্যতার কেন্দ্রে আছে পরিবার। পরিবারেরই সম্প্রসারণ হল গ্রাম। পরিবারের মানুষের পরস্পরের মধ্যে যে আত্মীয়তার সম্বন্ধ, তারই সম্প্রসারণ গ্রাম-সমাজে। এই গ্রাম সমাজকে তাই আত্মীয়-সমাজ বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অধ্যাপক অম্লান দত্ত এ কথার গুরুত্বকে অগ্রসর করে দিয়েছেন অনেক দূর পর্যন্ত।

রাষ্ট্রপ্রধান সভ্যতার কেন্দ্রে আছে নগর, রাজধানী। এই সভ্যতায় পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্র আত্মীয়তা নয়, ব্যবসায়। সভ্যতার অপেক্ষাকৃত অপরিণত পর্ব পেরিয়েও সুদীর্ঘকাল টিকে থেকেছে আত্মীয়-সমাজেরই বৈশিষ্ট্য। আত্মীয়তা ও ব্যবসায় সভ্যতার এই দুই চালিকাশক্তির যৌথতার মধ্যে যে পরিপূরকতার সম্ভাবনা ছিল, তার প্রসাদ থেকে বহুদিনই বঞ্চিত ছিল সভ্যতা। শুধু আত্মীয়-সমাজের বৈশিষ্ট্য সঙ্গে নিয়ে এক পায়েই তা চলেছিল যেন সুদীর্ঘকাল।

শিল্পবিপ্লবের কালে ব্যবসায়িক সমাজের বৈশিষ্ট্য ক্রমশ যখন যুক্ত হলো আত্মীয়-সমাজের অঙ্গে, তখনই সভ্যতা পেয়েছিল বোধ হয় দুই পায়ে চলার সম্ভাবনাময় প্রতিশ্রুতি। কিন্তু সমস্যা হলো, ব্যবসায়িক সংস্কৃতি ক্রমশ সর্বতোভাবে গ্রাস করে নিল আত্মীয়-সমাজ-বৈশিষ্ট্যকে। নিরর্বাধকাল এক পায়ে চলার অভিশাপ থেকে মুক্ত হল না সভ্যতা। শুধু বাঁ পায়ে চলছিল তো এবার শুরু করল শুধু ডান পায়ে চলা।

রাষ্ট্রপ্রাধান্যবাদের যুগে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের হাত ধরে গণতন্ত্রের নামে যে তন্ত্র বিশ্বের দিকে দিকে

প্রতিষ্ঠিত হল তা, বলাই বাহুল্য, দলতন্ত্রমাত্র। এই দলতন্ত্র রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের সঙ্গে যতটা যুক্ত, সময়ে সময়ে তার চেয়েও বেশি যুক্ত আদিম গোষ্ঠীতন্ত্রের সঙ্গেই। কম বেশি সব দেশের ক্ষেত্রেই কথাটা সত্যি। তবে একটু বোধ হয় পার্থক্য আছে। শিল্পবিপ্লবের সুযোগটা প্রথম প্রথম এটিয়ে নিতে পেরেছে যারা, তারা নানা দেশকে শোষণ করার সর্বাধিক সুযোগ পেয়ে যাওয়ার ফলে, সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে রাষ্ট্রপ্রাধান্যবাদের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েও এবং তার অনুসারী দলতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি করেও, বেশ কিছু দিনের জন্য যথেষ্ট ভালোই থাকতে পেরেছে যে, সে কথা স্বীকার না করাটা বোকামি। সেই জন্য গোষ্ঠীতন্ত্রের বহু বৈশিষ্ট্য আত্মস্থ করা সত্ত্বেও দলতন্ত্রকে সব সময় গোষ্ঠীতন্ত্রের মতো ভয়াবহ দেখায় না। শিল্প বিপ্লবোত্তরকালে শিল্পোন্নত দুনিয়ায় শিল্পপতি ও দলের যোগসাজসের ফলে বিরোধী দল তেমন বিপন্ন বোধ করে নি, অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশকে শোষণ বা লুণ্ঠন করার পথটা তাদের কাছে প্রায় অবাধে খোলা ছিল বলে।

সেকালে রাজাদের সৈন্যবাহিনী রাখতে হতো। পুরোহিত বা যাজকশ্রেণীও হাতে রাখা তাদের হিসেবের মধ্যে ছিল। শিল্পপতিরা দলকে হাতে রেখে সৈন্যবাহিনী এবং পুরোহিততন্ত্রের কাজগুলো একই সঙ্গে সেরে নেয়। এতে সাধারণ মানুষ সমাজ-প্রধান সভ্যতার দোষগুলোকে লাভ করে ঠিকই, কিন্তু গুণগুলোর অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। সমাজের শুভশক্তি পরাজিত হয়। আদিম গোষ্ঠীবাদের শক্তি আধুনিক দলবাদের ওপর ভর করে। অর্থাৎ এভাবেই সমাজকে মেরে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পোষকতার নামে, রাষ্ট্রবাদ হয়ে উঠল গোষ্ঠীবাদেরই পৃষ্ঠপোষাক।

আদিম গোষ্ঠীজীবন বীভৎস হয়ে উঠেছিল বলেই তার বুকে শুরু হয়েছিল পরিবার ও সমাজ-সৃষ্টির পরীক্ষা। ব্যক্তির সর্বোচ্চ বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজ যে বাধাই উপস্থিত করুক, একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে, তার সুরক্ষায়, পরিবার ও সমাজের ভূমিকার কোনো তুলনা নেই। যতদিন পরিবার ও সমাজের শক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল, ততদিন আজকের পৃথিবী যে দুটি বিষয়ে সব থেকে বেশি বিপন্ন হয়েছে — সেই পরিবেশের সংকট ও অসাম্যের উৎকটতা, একটা সীমার মধ্যেই ছিল। শিল্প বিপ্লব এবং তার দ্বারা জাত ব্যবসায়িক সমাজের দ্বারা সীমাহীনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রকৃতি এবং পরিবার।

এই দুটির ধ্বংসসাধন যে মহাবিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে পৃথিবীকে, তার মতো শিহরণকারী ঘটনা আর নেই। প্রকৃতি ও পরিবার এই দুইয়ের বিপর্যয়ের কারণের মধ্যেও একটা পরস্পর-সাপেক্ষতা আছে। শিল্পবিপ্লবের ফলে ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত প্রকৃতি তার সম্পদের ওপর সাধারণ মানুষের সহজ অধিকারকে ক্রমশঃ আরও সংকুচিত করেই চলেছে। ফলে সমাজে প্রতিযোগিতা তীব্রতর হয়েছে। প্রতিযোগিতার তীব্রতা মানুষকে স্থান থেকে স্থানান্তরে, কার্য থেকে কার্যান্তরে কেবলই ডাকছে আরও বেশি করে। পুরনো পারিবারিক পেশাগুলি গুরুত্ব হারাচ্ছে বলে মূল্য হারাচ্ছে সেই জাতীয় কাজ, পরিবারের সকলের সহযোগিতা বা পারিবারিক সংহতি ছাড়া যেগুলি দাঁড়ায় না। সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক শ্রমের ক্রমিক অব্যবহার ব্যক্তিগত সৃষ্টিশীলতাকে

দুর্বল করে তুলল। অর্গলিত সৃষ্টিশীলতা যন্ত্রের এবং যান্ত্রিকতা-বিকাশের যুক্তি ও বাস্তবতা তৈরি করলো উত্তরোত্তর বেশি মাত্রায়। আবার, অবরুদ্ধ সৃষ্টিশীলতারই বিকৃত উপজাত রূপে দুর্বার হয়ে উঠল ভোগবাদ। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যন্ত্র বা শিল্পবিপ্লব — এই চক্রগতি বা চক্রান্তেই আবির্ভূত হল।

পরিবারের ভেঙে পড়ার বাস্তবতাটা অপরিহার্য বলেই দেখা দিয়েছে আজ। প্রথমে ভেঙেছিল একান্নবর্তী পরিবার। দাঁড়াল বাবা-মা-সন্তান সহ ছোট পরিবার। ভাঙন চলমান। ছেলে মেয়েরা ক্রেশ-এ অথবা হস্টেলে। বাবা-মা পরস্পর বিচ্ছিন্ন। শিল্পোন্নত দেশের অর্ধেক মানুষের ক্ষেত্রেই এটা প্রায় সত্য। একা মানুষও অখন্ড থাকতে পারছে না। নিজের মধ্যেই নিজে দ্বিখন্ডিত হয়ে যাচ্ছে — নানা চিত্তবিকারে।

আদিম গোষ্ঠীজীবনের নৈরাজ্য কাটিয়ে যে পরিবারপ্রথার পরীক্ষা শুরু হয়েছিল, তার নানা সীমাবদ্ধতা থাকা সম্ভব। এই সীমাবদ্ধতা হয়ত তেমন কোনো সমস্যাই নয়। ঠিকমতো বুঝতে পারলে নিশ্চয় তার অনেকটাই দূর করা যায়, প্রশমিত করা যায় তার উগ্রতাকে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, সেই পরীক্ষাকে সর্বাংশে ভুল বলে ঘোষণা না করে, তাকে অবাধে ধ্বংস হতে দিচ্ছি আমরা। অথচ ধর্মের কল্যাণকামী, শুভঙ্করী ও সম্প্রীতিমূলক অংশগুলি মুখ্যত সৃষ্টি হয়েছে তখনই, সভ্যতা যখন পরিবার ও সমাজ সৃষ্টির পরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলেছে। অসম্ভব নয় যে, আদিম গোষ্ঠী-জীবনের স্মৃতি, তার অন্ধ আচার, তার রোমহর্ষকতা সৃষ্টির মোহ ক্ষণে ক্ষণেই উঁকি দিয়েছে এই উন্নততর পরীক্ষা-পর্বেও। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, মানুষের ইতিহাসের মহত্তর চিন্তা ও চেষ্টাগুলি লালিত হয়েছে সভ্যতার এই সাধন-পর্বেই। যে চেষ্টা বস্তুপ্রযুক্তিনির্ভর, যেমন চিকিৎসা-পরিবহন-যোগাযোগ-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে, মনে রাখতে হবে, সভ্যতার ইতিহাসে তার অবদান খুবই বৃহৎ হলেও, সেই অর্থে মহৎ নয়। প্রকৃতি ও পারিবারকে ঘিরে যে সংকট তৈরি হয়েছে দেখা যাচ্ছে, তার দ্বারা সব থেকে বিপদগ্রস্ত হচ্ছে প্রাণ। রবীন্দ্রনাথ 'শিশুঘাতী নারীঘাতী কুৎসিত' বীভৎস সভ্যতার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে ছিলেন। কারণ, তখনও পর্যন্ত যুদ্ধের ফলে এমন খন্ড খন্ড বিপদই প্রকট হতো বেশি করে। মহাবিশ্বে আর কোথাও পাওয়া যায় নি যাকে, বিশ্বের বুকে একটি ছোট তিলের থেকেও ছোট এই পৃথিবীতে মাত্র কয়েক কোটি বছর ধরে যে টিম টিম করছে, সভ্যতার সক্রিয়তম অংশ ঐ বাজারবাদী সংস্কৃতি, সেই প্রাণের উদ্দেশ্যেই পাঠাতে শুরু করেছে প্রলয়ের পরোয়ানা, তার সুরক্ষার অনন্য দুটি আশ্রয় — প্রকৃতি ও পরিবারকে বিপর্যস্ত করে। দেশে দেশে মানুষের গড় আয়ুবৃদ্ধির হর্ষদায়ী সংবাদটিও তাই নিশ্চিন্ত করতে পারছে না আমাদের।

এই বিপর্যয়-পর্বের প্রথমটায় প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল রাষ্ট্র। সমাজবাদের পরীক্ষাকালে সমাজকে বাদ করে দিয়ে রাষ্ট্রবাদেরই প্রতিষ্ঠা ঘটে ছিল যেমন, রাষ্ট্রবাদের পরীক্ষার পরেও দেখা যাচ্ছে — সব ক্ষেত্রে না হলেও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এবং বাণিজ্য-পোষণকারী সংস্কৃতির প্রসারের ক্ষেত্রে — রাষ্ট্রের বেড়া ভেঙে পড়ছে দ্রুত। এই ব্যাপারটার গালভরা নাম দেওয়া হয়ে 'বিশ্বায়ন'। এই আংশিক বেড়াভাঙাকে যত ভালো নামই দেওয়া হোক এবং এর ফলে কিছু মানুষের যত বেশি ভালোই হোক, এর জন্যে পৃথিবী জুড়ে আর্থিক অসাম্য

ক্রমেই বেড়ে চলেছে — এ কথাটা স্পষ্ট। ২০০১ সালের রাষ্ট্রসংঘের মানব-উন্নয়ন রিপোর্টেও অসাম্যের কথাটায় খুব জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ১৯৯৩ সালেই পৃথিবীর দরিদ্রতম ১০ শতাংশ মানুষের আয় ধনীতম ১০ শতাংশ মানুষের আয়ের ১.৬ শতাংশ মাত্র। বিশ্বের ১ শতাংশ ধনীতম লোকের আয় দরিদ্রতম ৫৭শতাংশ লোকের আয়ের সমান। বিশ্বায়নের অগ্রগতির ফলে এই প্রকার অসাম্যের বৃদ্ধিও অব্যাহত। এই অসাম্য যে বাড়তেই থাকবে, তার নানা লক্ষণ পদে পদে স্পষ্ট। রাষ্ট্র তার কল্যাণকারী ভূমিকাকে সংকুচিত করে নিচ্ছে। ব্যবসাকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে সরকার তার হাত অবিশ্বাস্যরকমে সংকুচিত করেই চলেছে।

বাণিজ্যায়নের সার্বিক প্রসারের ফলে অধিকাংশ মানুষের কাছ থেকে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র — সবই যখন দূরে চলে যাচ্ছে, সেগুলি পরিণত হচ্ছে ব্যর্থ আশ্রয়ের বিবর্ণ স্মারকে। সেই শূন্যতার রন্ধ্রপথেই মানুষের সামনে দেখা দিচ্ছে সভ্যতাপূর্ব আদিম গোষ্ঠীবাদ। ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, শ্রেণী, দল কিংবা আঞ্চলিকতাকে ঘিরে মানুষ তাই ক্রমশ মারমুখী হতে চাইছে, বোধ হয় শেষ আশ্রয়ের খোঁজে আবারও অধিকার করতে চাইছে অন্ধ সেই আদিমতাধর্মী গোষ্ঠীবাদকেই।

অন্ধ কেন? পরিবার ও সমাজ ভাঙতে শুরু করেছে কাছের সম্পর্কগুলো আল্‌গা হতে শুরু করেছে যখন। সেই সঙ্গে সম্পদসৃষ্টির বিপুল সম্ভাবনাও আগোচরে অন্তর্হিত হয়েছে কখন, আমরা জানতেও পরি নি। একটা উদাহরণ দিই। পশ্চিমবঙ্গের কোনো গ্রামের একটি পঞ্চাশ বিঘের পুকুর। তার পাড়ে বাজার। সেই বাজারের ৬০ শতাংশ মাছই দূর থেকে আসা। প্রধানত, অন্ধ্র থেকে। ঐ পুকুর থেকে অন্ধ্রে মাছের চারা যেতে পারে। অন্ধ্রের ১০ বর্গফুটের চৌবাচ্চা থেকে দু' চার কেজির মাছ হয়ে তা বাজারে আসতেও পারে। কিন্তু স্থানীয় পুকুরে দু'চারশো গ্রামের বেশি ওজনের মাছ পাওয়া যাবে না। উদ্যান-কৃষি বা বিচিত্র কৃষির দুর্গতি, ঘরে ঘরে গৃহপালিত পশু বা কুটির শিল্পের উধাও হয়ে যাওয়া, একই কারণ-উদ্ভুত এবং তা হল ঐ কাছের সম্পর্কের গুরুত্বের অস্বীকৃতি— কাজে-কাজেই তার সম্ভাবনা-সম্পর্কে দিশাহীনতা। এই দিশাহীনতা আসলে ভিন্নতর লক্ষ্যবদ্ধতা-ই। বিদ্বেষের মারমুখী দর্শনের প্রচার ও প্রয়োগের ফলে গ্রামে-থাকা নিকটবর্তী খুব-গরিব আর কম-গরিব মানুষের মধ্যে সম্পর্কহানির সূত্রে যে-পরিমাণ সম্পদহানি ঘটেছে, তাকে নিছক দিশাহীনতা বলে মনে হতে পারে, সন্দেহ নেই। কিন্তু যখন দেখি, ঐ অনুৎপাদিত সম্পদ সৃষ্টির জন্যই দূরবর্তী মানুষদের মধেও নতুন নতুন সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং তারই ব্যাপকতর ও বিশ্বায়িত ব্যাপারকে বলা হয় 'ঐতিহাসিক বাস্তবতা', তখন তাকে নিছক দিশাহীনতা বলতে বাধে। এই নতুন নতুন সম্পর্ক সৃষ্টির ফলে পার্টি, প্রশাসন ও অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর ব্যবসায়ীদের দিকেই সম্পদ কেন্দ্রীভূত হতে থাকে বলেই, তাকে ভিন্নতর লক্ষ্যবদ্ধতা বলাই শ্রেয়। বিকেন্দ্রীকরণের সুভাষিত বিজ্ঞাপন সত্ত্বেও এই কেন্দ্রীভবন গ্রামের সাধারণ মানুষকে আরও বেশি করে করে তুলছে রিক্ত, নিঃস্ব, পরিত্যক্ত। শোনা যায়, আমেরিকায় প্রতিপালিত মুরগি সে-দেশের খাবার টেবিলে পৌঁছবার আগে প্রক্রিয়াকৃত হতে চিনদেশ পরিভ্রমন করে একবার!

সন্দেহজনক উজ্জ্বলতা নিয়ে যখন হাজির হয় দূরের সম্পর্কের আশ্বাস এবং সেই সন্দেহবশে যখন আমরা প্রতিবাদী আন্দোলনেও ব্যাপৃত হই, তখনও কাছের সম্পর্ককে ঘিরে যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে, সে সম্পর্কে পরীক্ষার ব্যাপারে আমাদের শক্তি সৃষ্টিশীলতার পথে সমবায়িত হতে পারে না — এটাও কম অন্ধকার নয়। অর্গলিত সৃষ্টিশীলতার পথে ভোগবাদ এল, কিন্তু সমবায়িত শক্তিচর্চার পথে ছোট ছোট সম্পর্কের সম্ভাবনাগুলো নিয়ে পরীক্ষার প্রস্তুতি গড়ে উঠল না — সাম্প্রতিককালে সংঘটিত লালগড়ের অবরোধের থেকেও এ অবরোধ অনেক কঠিন, অনেক শ্বাসরোধী। বোধহয়, এই অবরোধই লালগড়ে অবরোধ-সৃষ্টির অন্যতম কারণ। শুধু লালগড় নয়, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, গোর্খাল্যান্ড, কামতাপুর — প্রভৃতি আন্দোলনেও দূরের সম্পর্কসৃষ্টির দ্বারা ঐ সব জায়গার মানুষের সম্পদ শোষিত হয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে এবং হতে চেয়েছে যতটা, কাছের সম্পর্কের দ্বারা সম্পদের সৃষ্টি ও বন্টন ঘটতে পারে নি সেই পরিমাণে। অথচ লালগড়ে-করা আকস্মিক অবরোধের অসুবিধেকে আমরা যত সহজে দেখতে পাই, লালগড়বাসীদের পরস্পর-সম্পর্কের অন্তর্গত ধারাবাহিক অবরোধের অকল্যাণরূপকে তত সহজে দেখতে পাই না। পাই না বলেই, এই সব মানুষের শেষ আশ্রয় হতে চাইছে যে গোষ্ঠীবদ্ধ মারমুখিতা, তার মানে বুঝতেও বেগ পেতে হচ্ছে আমাদের। তাদেরকে শুধুই উন্নয়ন-বিরোধী বলে ধরে নিয়ে আমাদের বুদ্ধি ঘুমিয়ে পড়তে চাইছে। এভাবেই শোষণমুখী, দূরের সম্পর্ক- প্রধান উন্নয়ন, নির্বিকল্প, নিষ্প্রশ্ন বৈধতার দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়, বন্টনমুখী, নিকট-সম্পর্কপ্রধান গ্রামীণ সঞ্জীবনের সম্ভাবনা পড়ে থাকে আমাদের দৃষ্টির বাইরে!

মিলনের নয়া ক্ষেত্র

'শেষ আশ্রয়' কথাটির মধ্যে পুঞ্জিত হয়ে আছে একটি বোবা উদ্বেগ। হয়তো অভিমানও। উদ্বেগ অভিমান বাদ দিয়ে, নিতান্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে দেখলে একথা কি প্রত্যয়যোগ্য যে, এক মাত্র রাষ্ট্রই সার্বিক আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে দেখা দিতে পারে আজকের মানুষের কাছে? সীমান্ত প্রতিরক্ষা, অভ্যন্তর সুরক্ষা কিংবা সরকার বা প্রশাসন পরিচালনার ওপরের দিকের অতিব্যয় আশু কমানো কি আদৌ সম্ভব হবে? শিক্ষা বা স্বাস্থ্যে কেন্দ্র থেকে সাধারণ মানুষের জন্যে ১০০ টাকা খরচ করলে লক্ষ্যস্থলে ১৫ শতাংশের বেশি কবে কীভাবে পৌঁছাবে, তা কি আমরা কেউ জানি?

ব্যক্তি কি তার অন্তর উন্মোচনের দ্বারাই কেবল শান্তি, সামঞ্জস্য সমৃদ্ধি প্রভৃতি লাভ করতে পারে যথোচিত পরিমাণে? ব্যক্তিগত শুদ্ধি বা শক্তি চর্চার বিরুদ্ধে কোনো কথাই নেই। কিন্তু সমষ্টিগত সাধনার একটা ক্ষেত্রও আমাদের টিকে থাকার জন্য জরুরি বলেই মনে হয়। চিরাচরিত সমাজ যা তার দোষ-গুণ সমেত রাষ্ট্রপ্রাধান্যবাদের দ্বারা মৃতবৎ হয়ে পড়েছে, তাকে কি তার স্বরূপে আজ পুনর্জাগ্রত করা আদৌ উচিত অথবা সম্ভব? অথচ দেখতে পাচ্ছি, শান্তি ও সামঞ্জস্য আগের থেকে অনেক বেশি মূল্যবান হয়ে উঠেছে আজ।

পুরনো পরিবার ও সমাজকে আমরা আজ কিছুতেই ফিরে পাব না আর। বস্তুরূপকে ফিরে না পেলেও, তার আত্মরূপকে আমরা কিছুটাও পুনরাবৃত্ত করতে পারি, তার আশীর্বাদকে লাভ করতে পারি। তাকে দিয়েই কাটাতে পারি গোষ্ঠীবাদিতার পিছুটানকে। পরিবারের প্রতিষ্ঠা এবং তার সুরক্ষার পথে সমাজের সৃষ্টি হয়েছিল বলেই সমাজ ও পরিবার গোষ্ঠীবাদের মৌলিক বিরোধিতায় এতখানি অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু বৈশ্য সমাজ আশ্রিত ব্যক্তিবাদ তা পারে না।

কিভাবে লাভ করতে পারি সে আশীর্বাদ? আমরা জানি, ব্যবসায়িক সমাজে আর্থিক সম্পর্কটাই প্রধান। আর আত্মীয় সমাজে আত্মিক সম্পর্কটা। এও জানি, আর্থিক সম্পর্কের অতিপ্রাধান্যের ফলে মানুষ ভয়াবহভাবে বঞ্চিত হয়ে চলেছে সেই সম্পদ থেকেও, যা সে আত্মিক সম্পর্কের মাধ্যমে খুব সহজেই লাভ করতে পারে। আর্থিক এবং সরাসরি বস্তুবিনিময়ের যৌথতা বা তার সামঞ্জস্যের দ্বারাই সে সম্পদ অর্জিত হতে পারে। এভাবে আমাদের রাজ্যে মাছের ও পশু-সম্পদের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ ভাগ এবং সবুজ-সম্পদের ক্ষেত্রে একশো ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। এবং তার সুফল সব রকমের আমরা-তোমরা নির্বিশেষে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব একটু নতুনভাবে।

আর্থিক ও আত্মিক সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য কীভাবে সম্ভব, সেটা নিশ্চয়ই পরীক্ষা ও তার ফলাফলের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হতে পারে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির লক্ষ্যে এ দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আজ বিশেষ করে কেন প্রয়োজন, তা বোঝা চাই। এটা বোঝাবার জন্যে বিভিন্ন যুগে সম্প্রীতি কেমন করে সাধিত হয়েছে বা তার সাধনের কথা বলা হয়েছে, তা একটু দেখে নেওয়া দরকার।

আমরা জানি, রামমোহন ভারতীয় সমাজ-সাধনায় ত্রিবেণীসঙ্গমের কথা বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই চিন্তাকেই আরও গভীরতা ও পরিণতি দান করেছেন মূলত তাঁর 'অচলায়তন' নাটকে। রামমোহন বলেছেন হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রিস্টান —এই তিনের মধ্যে সমন্বয়ের কথা। চৈতন্যও যে সমন্বয়ের কথ বলেছিলেন, তার মধ্যে ত্রয়ী-ভাবনারই অনতিস্পষ্ট প্রকাশ দেখি। যেখানে আছে তথাকথিত উচ্চতর হিন্দু, নিম্নতর হিন্দু এবং মুসলমান সমাজ। রবীন্দ্রনাথ 'অচলায়তন' নাটকে অচলায়তনিক, শোনপাংশু ও দর্ভকদের নামে সমাজের সম্ভাব্য ত্রিধারার মধ্যে বা ত্রিস্তরীয় সাধনার —জ্ঞানযোগ-কর্মযোগ-ভক্তিযোগের মধ্যে সমন্বয়ের কথা বলেছিলেন। এসবের খুঁটিনাটি খুবই আগ্রহের বিষয় হলেও আপাতত তত জরুরি নয়।

চৈতন্য, রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের ত্রিবেণী সঙ্গম-সাধনা শুধু সেই সেই যুগের পক্ষেই নয়, আজও প্রাসঙ্গিক। আমরা সমন্বয়-সাধনার যে একটি নতুন প্রযুক্তির কথা বলছি, তা আমাদের পূর্বসূরী ঐ সব মহৎ প্রপিতামহদের নির্দেশিত পথের সহযোগী বা পরিপূরকরূপেই কাজ করতে পারে। ঐ প্রপিতামহগণ যা বলেছিলেন, তার লক্ষ্য ছিল আত্মীয় সমাজের বিকার-সংশোধন। আধুনিককালে রামমোহন এবং রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁদের ধারণা গড়ে তোলেন, তখন সাম্রাজ্যবাদের সুবাদে দেশে ব্যবসায়িক সামাজিক শক্তি প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করেছে। কিন্তু তাঁদের নির্দেশিত ঐ সমন্বয়-তত্ত্বে ব্যবসায়িক সমাজের শক্তিকে ব্যবহার করার কথাটায় জোর দেওয়া

নেই। আজকের কালে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সৃষ্টিতে আর্থিক বা বৈশ্য সমাজের ভূমিকা সব থেকে বেশি বলে তার বিকারের সংশোধনের প্রশ্নটিকে উপেক্ষা করাই যায় না। বিশ্বায়নের সমস্যার মোকাবিলায় তা আরও জরুরী।

'স্বদেশী সমাজ' ও 'সমবায়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সামাজিক সমন্বয়ের সঙ্গে সম্পদ-সৃষ্টির প্রশ্নটিকে যুক্ত করে আত্মিক ও আর্থিক সম্পর্কের যৌথতার গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। এটা সমগ্রতা-বোধেরই পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথে পৃথিবী এগোয় নি, এগোয় নি তাঁর নিজের দেশও। সমবায় আন্দোলনের যে চেষ্টা স্বাধীনতার পরে দেশে হয়েছে, তা কেন্দ্রায়নবাদী ব্যবস্থার যান্ত্রিকতার প্রভাবে জড়তাপ্রাপ্ত হয়েছে, রুদ্ধ হয়েছে তার সৃষ্টিশীলতা। আর্থিক বা ব্যবসায়িক সমাজের বিকারকে শোধন করার পক্ষে তার কোনো ভূমিকাই ফুটে ওঠে নি।

আজ বিশ্বায়নের যুগ। সব কিছু নিয়ন্ত্রিত বাজার-ব্যবস্থার দ্বারা। অর্থবিনিময়ের মধ্যস্থতা ছাড়াও মানবিক সম্পর্ক-বিনিময়ের দ্বারাও যে বস্তু বা জৈববস্তু লাভ করা যেতে পারে, সেইটা আমদের মনে আসে না সহজে। আমরা মনে করি অর্থের অভাবই দারিদ্র, জৈব বস্তুর অভাব নয়। অর্থের বিনিময়ে কী কী কত পরিমানে পাওয়া যায় এইটা অভিজ্ঞতা করতে করতে আমরা প্রায় বেমালুম ভুলেছি — মানবিক সম্পর্কের দ্বারাও লাভ করা যায় আরও প্রায় একশো শতাংশ সবুজ, পঞ্চাশ শতাংশ মৎস্য ও পশু সম্পদ এবং অসংখ্য ছোট ছোট শিল্প সৃষ্টির সম্ভাবনাকে। যেন এগুলিকে অলীক কল্পনা ভাবা ছাড়া আর কিছু করবার নেই আমাদের। আমরা আত্মীয়-সমাজের স্মৃতিকে হারিয়েছি বলে তার শক্তিকেই শুধু নয়, স্বপ্নকেও খোওয়াতে বসেছি। আর একথা কে না জানে যে, মানুষের স্বপ্ন দেখার অধিকারকে হরণ করা, জীবনের অধিকারকে হরণ করার থেকে এতটুকু কম পৈশাচিক নয়! বস্তুত, যে-কোনো আগ্রাসনের প্রধান শহিদ ব্যক্তি বা সমাজের স্বপ্ন দেখার অধিকার!

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের সম্ভাবনাটা অনুধাবন করা দুরূহ নয়। বিপর্যস্ত সম্পর্কটার পুনরুদ্ধারের সূচনা সভ্যতার কোন্ প্রান্ত দিয়ে শুরু হতে পারে, তাও তত দুর্বোধ্য লাগবার কথা নয়। প্রশস্ত প্রকৃতি এবং মুখোমুখি মানব-সম্বন্ধের অবকাশ গ্রামেই লভ্য, এটা সকলেরই জানা। কিন্তু এও জানা যে, গ্রাম আজ পরিত্যক্ত পৃথিবীর অন্তর্গত। তাকে ছেড়ে যাওয়াটাই রীতি। রাষ্ট্রবাদী ব্যবস্থার অনুসারী প্রযুক্তি বা আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাটা তার ওপর খুব বিচার করেই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, এইটা ভাববার মতো যুক্তির অভাব রয়েছে। কৃষি বা শিল্প প্রযুক্তিও তারই অনুসারী এবং সর্বাংশে আত্মঘাতী পথে অগ্রসর। বিকল্প চিন্তা জোর পাচ্ছে। তাই সম্পর্কপ্রধান কৃষি বা শিল্প-ব্যবস্থার বিশাল সম্ভাবনাটা লক্ষ্যগোচর হওয়ার পর মানুষ আবার অল্পে অল্পে আশা করতেও শিখবে, স্বপ্ন দেখতেও চাইবে - এমন অনুমান অযৌক্তিক নয়।

আশ্চর্য একটা ব্যাপার এই যে, গ্রামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় না — দেরিতে হলেও সেটা আমরা অবশেষে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম। অথচ বিধ্বস্ত গ্রামই যে বেকারত্বের যোগান দেওয়ার সুবাদে শহরে শহরে প্রতিযোগিতাকে একটা সৃষ্টিছাড়া মাত্রায় পৌঁছে দেয় এবং তার ফলেই জোরালো হয় গোষ্ঠীগত বিদ্বেষ বিস্তারের

যুক্তিটা, সেটা আমরা ভালো করে বুঝি নি। গোষ্ঠী-বিদ্বেষ ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, দল, ভাষা, আঞ্চলিকতা — যে কোনো একটা বা কয়েকটাকে নিয়েই ঘটতে পারে। ধর্ম যেহেতু মানুষের বিশ্বাসের গভীর তলকে ছুঁয়ে থাকে, ধর্মকে ধরেই মানুষের আবেগ সহজে উদ্রিক্ত হয়, ভুল পথে তার ব্যবহারযোগ্যতাও তাই সব থেকে বেশি। উত্তর ভারতে বর্ণ-বিদ্বেষ বেশি ভয়াবহ। মহারাষ্ট্রে ভাষা বা জাতি-বিদ্বেষ। দলীয় বিদ্বেষকে তো যখন তখন যত্রতত্র দেখতে পাই।

আমাদের দেশের সমাজ-প্রধান ব্যবস্থায় শ্রেণীগত বিদ্বেষ কখনোই তেমন ব্যাপক না হলেও শ্রেণীগত শোষণ দুর্লভ ছিল না। জামিদারি-তন্ত্রের বিলোপের মধ্য দিয়ে শোষণের উৎকটতা অবসানের একটা প্রতিশ্রুতি ফুটে উঠেছিল বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে ছোট ছোট জমির মালিক ও বর্গাদার বা দিন মজুরদের মধ্যে শ্রেণী-বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস বেড়ে ওঠে। এভাবে সম্পর্কের বিনষ্টির পথ ধরেই গ্রামের সব রকমের আমরা-তোমরার মধ্যে বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস বেড়ে ওঠে। এভাবে সম্পর্কের বিনষ্টির পথ ধরেই গ্রামের স্বয়ম্ভরতা ক্রমশঃ হারিয়ে যায়। মূল্যবান-সম্পর্কের বিনষ্টি দলের বা দলতন্ত্রের শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধির উপায় হয়ে ওঠায় বিদ্বেষই হয়ে উঠলো এক ধরনের মূল্যবান মূলধন। ফলে নানা রকম 'আমরা-তোমারা'কে নিয়ে খেলা-ধূলা করতে উৎসাহী হয়ে উঠলো দলগুলি। আজকের রাজনৈতিক দলগুলি এর বাইরে নিজেদের অস্তিত্ব বা প্রাসঙ্গিকতা রক্ষা করা যায় কীভাবে, তা নতুন করে ভাবতে চায়ও না, পারেও না। কখনও কতকটা ঘুমন্ত আবার কখনও জাগ্রত অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এই মূলধনটার ব্যবহার সহজ হয়ে না আস্‌লে, শহরের সাম্প্রদায়িক বেয়াদবি গ্রাম থেকেও নীরব সমর্থনের পোষকতা পেত না।

যাঁরা এক ধরনের বিদ্বেষের দ্বারা বেশি আহত হন, তাঁরা অন্য ধরনের বিদ্বেষকে কম বিপজ্জনক মনে করে থাকেন সাধারণত। ফলে অনেক সময় এক ধরনের বিদ্বেষ থেকে বাঁচতে আশ্রয় নিতে চান আর এক ধরনের বিদ্বেষের। ভয়কে ভয়ের দ্বারা এবং ভুলকে ভুলের দ্বারা ঠেকানোর মতোই তা অর্থহীন, উদ্ভট। ভুলকে যেমন ঠেকাতে হয় নির্ভুলতা দিয়ে এবং ভয়কে সাহস দিয়ে, তেমনি বিদ্বেষের শুধু প্রশমন নয়, মূলোৎপাটন করতে হয়, সম্প্রীতি দিয়েই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, বিদ্বেষের মূলধন-মূল্যের ব্যবহার যত সহজ, সম্প্রীতির মূলধন-মূল্যের ব্যবহার তত নয়। কারণও স্পষ্ট। জলকে ওপরের দিকে তোলা কঠিন, নিচের দিকে গড়ানো নয়।

সম্প্রীতির মূলধন-মূল্যের ব্যবহার দেশ বা রাজ্য জুড়ে নয়, ছোট গ্রামের স্বল্প সংখ্যক মানুষের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ার দ্বারাই সম্ভব। এভাবে যার কিছু নেই, কাজও তেমন নেই, তার জন্যে বছরে ১০/১৫ হাজার টাকা আয়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব। যাদের জমি আছে তাদের মিলিত করে এ কাজ হবার নয়। যারা ভূমিহীন দিন-মজুর, শুধু তাদেরকে মিলিত করেও নয়। এই দুই পক্ষকে মেলাতে হবে। আজকের দিনের সর্বশক্তিমান দল এ কাজ পারবে না। করতে হবে সব দলকে মিলিয়ে। সব দলকে মেলানোর প্রসঙ্গটা কল্পনার অতীত ব্যাপার

নয়। সাময়িক কিছু বিঘ্ন দূর করার জন্যে সর্বদলীয় সমিতি গঠনের কথা শোনা যায় প্রায়ই। প্রয়োজন সেই সাময়িক প্রয়াসকে শুধু মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করা। সম্প্রীতিকে যদি একটা ভাব-চর্চার বিলাসিতার মধ্যে বন্দী করে রাখতে না চাই, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলধনরূপেও তাকে খাটাতে চাই, তবে ভূমিমালিক ও ভূমিহীন মজুরদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী বাস্তবসম্মত একটি মঞ্চ গঠন করতে হবে। এই মঞ্চ কাজ করবে শুধু ভাবাদর্শ প্রচারের নয়, আর্থিক লাভেরও লক্ষ্যে। শুধু ভূমিমালিক বা মজুরদের স্বার্থে নয়, মঞ্চের নিজস্ব আর্থিক স্বয়ম্ভরতার স্বার্থেও। প্রক্রিয়াটিকে সফল করার জন্যে পরীক্ষা শুরু হওয়া চাই, আগেই বলেছি - ছোট করে। ৫০০ থেকে ১৫০০ মতো লোক নিয়ে। মালিক-মঞ্চ-মজুর —তিন পক্ষেরই লাভের স্বার্থে, যেখানে অর্থ-বিনিময় ছাড়াও সরাসরি ভোগ্যবস্তু বিনিময়ের একটা অবকাশ থাকবে এবং মধ্যস্থতাকারী পক্ষের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা তাদের গৃহীত কাজের মধ্যে থেকেই সম্ভব হবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তিন পক্ষ কেন? দুই-এর সম্পর্ক সাধনে তৃতীয় পক্ষের সাহায্য প্রকৃতিরই বিধান-সম্মত। সমাজেরও। পরমাণু-কেন্দ্রকে যেমন মেশন- এর ভূমিকা মধ্যস্থতাকারী বা অনুঘটকেরই, সমাজের মধ্যেও প্রতিনিয়তই তা দেখতে পাই আমরা। রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে সখীদের ভূমিকা সকলেরই জানা।

উপমা স্বভাবত পিচ্ছিল। তার আশ্রয়ের আমাদের প্রয়োজন নেই। কোনো মঞ্চের মধ্যস্থতা আমরা প্রত্যাশা করব কিনা, এ সম্পর্কেও কোনো তর্ক নেই। ওটা হামেশাই আমরা গ্রহণ করে থাকি। তর্ক হচ্ছে, সম্প্রীতি নামক বিশুদ্ধ ভাবকে অর্থনৈতিক এবং কাজে কাজেই সমাজনৈতিক উন্নয়নেরও অবলম্বনরূপে পরীক্ষা করতে আমরা উৎসাহিত হব কিনা। সম্প্রীতিসাধনা শুধু স্বল্প মেয়াদি বা উপরিতলগত শহুরে কিছু মিহি কর্মকান্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে কিনা। প্রকৃতি, পরিবার ও প্রাণের মহা সংকটের দিনে, সকলে মিলে বাঁচার জন্য সম্ভাব্য ছোট ছোট পরীক্ষার পথ খুলে রাখার পক্ষে সকলে মিলে মারা পড়ার আশঙ্কাটা কোনো জোরালো যুক্তি হতে পারে না। কেননা সাধারণত ব্যক্তিগত মৃত্যু সম্পর্কে যাঁরা সব থেকে বেশি ভীত, সকলের সঙ্গে একযোগে মারা পড়ার আশঙ্কা সম্বন্ধে তাঁদের আশ্চর্য অসাড়তা দেখা দিতেই পারে। অন্য যুক্তি খুঁজতে হবে। সে হলো, সম্প্রীতি এবং আনন্দ হলো সেই যুক্তি। ছোট ছোট কাজের মধ্যে, তদাশ্রয়ী সম্পর্কের মধ্যেই তার বিকাশের অপার সম্ভাবনা।

সাম্রাজ্যবাদী যুগে শুরু হয়েছিল বড়রই প্রতিষ্ঠা। বিশ্বায়নের যুগে ব্যাপকতর হয়েছে তা। এখন আর ব্যক্তিগত ছোট ছোট উদ্যোগ দাঁড়াবার শক্তি পাচ্ছে না কিছুতেই। সবই 'বিগ বাজারের' দখলে চলে যেতে চাইছে। চূড়ান্ত বিপর্যয় পর্যন্ত এ বৃদ্ধিকে অব্যাহত রাখাই কি শেষ পর্যন্ত আমাদের একমাত্র কর্তব্য? অথবা অসহায় গালি-গালাজ করা? না কি যা চলছে তার পাশাপাশি ছোটর শক্তি পরীক্ষার সম্ভাব্য আয়োজনেও যুক্ত হওয়া উচিত আমাদের?

আজকের দিনে গ্রামে গ্রামে ছোটর শক্তি-পরীক্ষা কীভাবে হওয়া উচিত? মনে হয়, ছোটরা, সামান্য

উঁচু-নিচু-সমেত, সকলে মিলিত হয়ে, একটি সৃষ্টিশীল সমবায়ই গড়ে তুলতে পারে। পারে পারিবারিক বা ব্যক্তিগত উদ্যোগকে কোথাও গ্রাস না করে উল্টে তাকে সহায়তা করে এবং সরকারি সহায়তাকে কাজে লাগিয়েও। ১৫ থেকে ২০ শতাংশ যে অব্যবহৃত ক্ষেত্র আছে, সেটুকুতেই সীমাবদ্ধ থেকে। মূলত উদ্যান-কৃষি ও প্রাকৃতিক চাষে সহযোগিতা করে, ধানের জমি ও অন্যান্য জলায় মাছ-চাষ এবং ঘরে ঘরে পশু-সম্পদকে পৌঁছে দিয়ে এবং তার আনুষঙ্গিক কুটির-শিল্পের সম্ভাবনাকে উদ্‌ঘাটন করে এই সৃষ্টিশীল সমবায় কেমন করে গ্রামের পুনর্জাগরণ ঘটাতে পারে, তা গুরুতর আলোচনারই বিষয়। ক্রমাগত পরীক্ষা করে, সকলে মিলেই ক্রমশঃ তা নির্ধারণ করবারও বিষয়। বর্তমান লেখক এ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছে 'নতুন গ্রাম ঃ অন্য পথে' (প্রকাশিত), Auto-functional Green Movement for Social Economic and Ecological Harmony (www.jisgoswami.wix.com/shgsjyoti) প্রভৃতি পুস্তিকায়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, মধ্যস্থতাকারী মঞ্চ কি আগের যুগের জমিদারতন্ত্র বা এখানকার দলতন্ত্রের মতো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে না? পারে যে, সে-সম্বন্ধে সন্দেহ না থাকাই উচিত। মঞ্চ না হয়ে অন্যগুলি হলে পৃথিবী ও প্রাণের পক্ষে কী ক্ষতি হবে? এই চিন্তাটাই যথেষ্ট নয় মঞ্চের যথার্থ কার্যকারিতার পক্ষে। কেমন করে গঠিত হবে তা, কেমন করে সম্ভাব্য বিকার থেকে রক্ষা করতে হবে তাকে, সে সব চিন্তাই বেশি দরকারি। বিশ্বায়ন যে সমস্যা সৃষ্টি করেছে, দ্বৈপায়নের পরিপুরকতার দ্বারা তাকে প্রশমিত করার পরেও তাই 'দরকারি' কাজের অভাব না হবারই কথা।

এই 'দরকারি' কাজের প্রথম ধাপই হবে আমাদের প্রত্যাশিত ছোট ছোট সমাজ-এককের মধ্যে একটি একা-মানুষকে খুঁজে নেওয়া, বহু মানুষ যাঁর প্রতি নত হয়েই বড় করে তোলে নিজেকে, লাভ করে গৌরব। অপর দিকে, বহু মানুষের স্বাভাবিক নতিই যাঁকে বড় করে তোলে — মন্দির যেমন মঙ্গল-ঘটকে। 'আমি কোথায় পাব তারে' বলে হায় হাসান, হায় হোসেন' করলে হবে না। মনের মানুষেরা অনেকেই আছেন উপেক্ষা কিংবা অন্যমনস্কতার আড়ালে অবগুণ্ঠিত হয়ে। 'স্বদেশী সমাজ'-এ রবীন্দ্রনাথ এমন মানুষকেই বলেছেন 'সমাজপতি'। এই সমাজপতি-তত্ত্বের ভালোমন্দ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক কথা বলেছেন। সে সব পুনরুক্তি করবো না। উৎসাহী শুভব্রতী সমাজ-সাধক তা দেখে নেবেন।

সকলের জন্য সম্পদ সৃষ্টিব— ভাব-সম্পদ ও জৈব সম্পদ সৃষ্টির প্রয়োজনে, এই ছোট ছোট সমাজপতিদের পেতে হবে সকলের সম্মতিতেই। সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্বাচিত করে নয়। কারণ এ ক্ষেত্রে সেটা যথেষ্ট নয়। সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচনের গৌরব একটি ব্যক্তিত্বকে ঘিরে যে বিভূতি বিকশিত করে তোলে, সকলের জন্য সম্পদ সৃষ্টির প্রয়োজনে তার ভূমিকাটিকে আমাদের একটু একটু করে বুঝে নিতে হবে নিরাসক্ত বুদ্ধিতে ও পরম আন্তরিকতায়। যাইহোক, এই রকম মানুষের দেখা আমরা অনেক পাই। ঐ দুই দিনের সভাতেও পেয়েছি। এইসব মানুষেরা এবং আমরা চিনিনা এমন আরও অনেকে যদি গ্রামে গ্রামে এক একটি মঞ্চের সঙ্গে নিজেদের আত্মীয়তা স্থাপন করেন এবং সম্প্রীতির বীজকে নিভৃতে সিঞ্চিত করতে থাকেন — তাহলে অভাবনীয়

ব্যাপার ঘটতে পারে।

পৃথিবী জুড়ে বৃহৎ শিল্প, বৃহৎ কান্ড-কারখানা যেমন তুলনাহীন ব্যাপকতায় বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি তা ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার পাশাপাশি তার আত্ম-সংকটই তাকে ক্রমশঃ বিপর্যস্ত করে দেবে— এমন সংকেতের অভাব নেই। কিন্তু পুরনো যুগ স্বাভাবিকভাবে ভেঙে পড়লেই নতুন যুগের আবির্ভাব আপনা-আপনি হয় না। শুরু হয় বিপর্যয়-যুগের। সেই বিপর্যয়ের বুকে নতুন যুগকে আনয়ণ করতে হলে নতুন বাণী চাই। পুরাতনের কাছ থেকে ধার করতে হলেও সই, কিন্তু নতুন হয়ে-ওঠা চাই। সেই নবীনতার জন্য চাই অন্য রকমের সাহস। অন্য রকমের বীরত্ব।

অল বেঙ্গল কম্যুনাল হারমনি কমিটি বা সমভাবাপন্ন এই জাতীয় যে কোনো সংগঠন শহরে যদি স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি কিছু কাজের সঙ্গে গ্রামের উপযোগী, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি কার্যক্রমকেও গ্রহণ করে, তাহলে এদেশে নবযুগের আবাহন ঘটবে বলে মনে হয়। তার নাম দেওয়া যায় একুশ শতকী রেনেসাঁস বা নবজাগরণ। এদেশে উনিশ শতকী রেনেসাঁস দেখা দিয়েছিল শহরে। প্রকৃতি, পরিবার ও প্রাণ শোচনীয়ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যাবার আগে যদি আর একটা রেনেসাঁসকে দেখবার সুযোগ হয় পৃথিবীর, তাহলে তা সূচিত যেখান থেকেই হোক, তাকে আশ্রিত হতে হবে গ্রামেই। তাকে নির্ভর করতেই হবে, শুধু চমকপ্রদ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ওপর নয় বা চটকদার বৈশ্য সংস্কৃতির ওপর নয়, — অকৃত্রিম মানব-সম্বন্ধের ওপরও। এক কথায়, সভ্যতার দুই পায়ে চলার সঙ্গতির ওপর।

নিকটবর্তী মানুষে-মানুষে এবং মানুষে-প্রকৃতিতে এই 'দ্বিপদী' সঙ্গতি-সাধনায় সফল হয়েই দূরের কাজেও প্রয়োজনীয় সামর্থ্য অর্জিত হতে পারবে বেশি করে। স্থানীয় ও আঞ্চলিক স্তরে অর্জিত শক্তি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরেও তার সামর্থ্যের প্রতিফলন ঘটাতে পারবে। সব থেকে জোরালো আওয়াজটা এভাবেই হয়তো তোলা সম্ভব হবে দূরের সেই ক্ষেত্রগুলিতেও, করণীয় প্রভূত কাজের অভাব নেই যেখানে। এভাবে, মানবিক সম্পর্কের দ্বারাও সম্পদ-সৃষ্টির সম্ভাবনাটিকে উদ্‌ঘাটিত করে দিতে পারলে, ইতিহাসে অবলুপ্তপ্রায় একটি শক্তির পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে। এবং এই পুনরুদ্ধারের দ্বারা ছোট ছোট গ্রাম থেকে সমগ্র গ্রাম-বিশ্বে তথা শহর-বিশ্বে ক্রমশঃ যা ছড়িয়ে পড়তে পারে, তা সামগ্রিকভাবে হয়ে উঠবে অন্য এক নবজাগরণ। এই জাগরণের জন্যেই যেন নিঃশ্বাস-বায়ু সংবরণ করে আর্ত অপেক্ষায়, প্রহর গণনা করছে, আমাদের একমাত্র আশ্রয় - আজকের এই বিষ-বিকার-জীর্ণ বিষণ্ণ বসুন্ধরা।

যে গিয়েছে দেখবার বাহিরে

সব মানুষের জীবনেই বোধ হয় একটা অসম্ভবের দেশের, একটা সব পেয়েছির দেশের হাতছানি থাকে। আমাদের ছোটবেলায় ছিল — এবং এখনও— বোম্বাই এই রকম একটি জায়গা। স্টারেদের দেখতে পাওয়ার জায়গা, স্টার হওয়ার জায়গা। ব্রহ্মকে পাওয়া বা স্বয়ং ব্রহ্ম হওয়াও ছিল যেন সে তুলনায় তুচ্ছ। সুতরাং বোম্বাইয়ের কোথাও হারিয়ে যাওয়ার জন্যে অনেকে পালিয়ে যেত। আর 'মানা'টা যাদের ক্ষেত্রে বেয়ারা রকমের বড় হয়ে উঠতো, তারাও যেত — কিন্তু 'মনে মনে'।

আমার ক্ষেত্রে ঐ জায়গাটি ছিল শান্তিনিকেতন। বর্ধমান জেলার একটি গ্রামের ছেলের কাছে শান্তিনিকেতনের এমন সব হতে আপন হয়ে ওঠার কিছু কারণ ছিলই। কিন্তু তা এমন দুর্বার হলো কি করে, তার রহস্যজনক রসায়নটা সুনির্ণেয় নয়। আমার দিদিমা শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন কি না জানিনা। কিন্তু তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত শুধু ভালবাসতেন তাই নয়, সেই গানের জন্য প্রাণও দিয়েছিলেন। কালনার কাছের গ্রামে ছিল তাঁর শ্বশুরবাড়ি। স্বামী ছিলেন এম.বি. পাস ডাক্তার। অল্প বয়সেই মারা গিয়েছিলেন। দিদিমা রবীন্দ্রনাথের গানকেই আশ্রয় করেছিলেন। আরও একটা ছোট দোষ ছিল তাঁর। চা খাওয়া। সেই গ্রামে এ দুটোই ছিল বেলেল্লাপনা, যার কোনোটাকেই ত্যাগ করতে না পেরে অথবা পেরে, তিনি, হয়তো আরও কী কী গভীর অসুখে, প্রাণত্যাগ করেন সেই চারের দশকের প্রথমেই।

আমার মা দিদিমার বিশেষ কিছুই মনে করতে পারেন না। শুধু মনে পড়ে যেন 'মা বুঝি গান গাইত আমার দোলনা ঠেলে ঠেলে'। শুধু দেখতে পান 'মা গিয়েছে, যেতে যেতে গানটি গেছে ফেলে'। সেই যে তিনি কুড়িয়ে নিয়েছেন তাঁর মায়ের ফেলে যাওয়া ধন, শত ঝড় ঝঞ্ঝায়, শত বিরূপতা ব্যস্ততায় তার আর অনাদর করেন নি জীবনে। এখনও প্রাণান্তকর পীড়ায় দীর্ণ হতে হতেও সেই সুরের ঝর্না তলায় তাঁর বিভগ্ন মাটির কলসটিকে আজও প্রতিদিন ভরে ভরে নেন তিনি অস্খলিত শৃঙ্খলায়।

আর আসতেন দাশুদি-কীটুদি-খুকুদি। রবীন্দ্র শ্যালক-নগেন্দ্রনাথের দৌহিত্রী তাঁরা। আমাদের আত্মীয়া। গানে আর আলপনায় আমাদের বাড়ির উৎসবগুলিকে তাঁরা শুধু ভরিয়ে তুলতেন বললে কিছুই বলা হবে না। জ্ঞান হবার আগে থেকেই তাঁদের গানও শুনেছি। শিখিনি কখনো। কিন্তু হাজার খানেক গান কবে যে আমার কণ্ঠে জায়গা করে নিল, হিসেব জানি না। এইটুকু জানি, জ্ঞানে ঘাটতি আছে বিস্তর। কিন্তু অনুভব করি, প্রতিটি গানকে আমি যেন চিনি গভীর আত্মীয়তায় — ততটা বহিরঙ্গ চিত্ররূপে নয়, যতটা অন্তরঙ্গ চরিত্ররূপেও বা!

শান্তিনিকেতনকে চোখে দেখবার আগেই তার বাঁশি আমি শুনেছি। দশ বছর বয়সে যখন সুযোগ ঘটলো রিক্সায় মায়ের কোলে বসে দেখার, বাঁশির সেই সুরটা কোথাও ছিঁড়ে গেল না। খুব সম্ভাবনা ছিল। কারণ বাঁধা ছিল সেটা কল্পনাতীত উচ্চতায়।

কেন যে ছিঁড়ে গেল না, তারও একটা কারণ আছে বোধহয়। রবীন্দ্রনাথের জন্ম এবং মৃত্যু সন আমি সেই বয়সেও জানতাম। কিন্তু এটা জানতাম না রবীন্দ্রনাথ মারা গেছেন বা আদৌ মারা যেতে পারেন। বোধহয় সেই নিরেট অজ্ঞানতাটা আমার মনের একটা বড় অংশকে আজও অধিকার করে আছে।

তো, সেই শান্তিনিকেতনে গিয়ে আমার মনের একটা অংশ যেন প্রথমবারের মতো বোধ করল রবীন্দ্রনাথ মারা যেতে পারেন। তাঁর ছুঁয়ে যাওয়া সব কিছু দেখতে দেখতে তাঁর অনুপস্থিতিটা এত উগ্ররূপে ফুটে উঠতে লাগলো যে, তাঁর মৃত্যুর ধাক্কাটা তাৎক্ষণিকের তীব্রতায় দেখা দিল আমার কাছে। ফলে, মূর্ছা ছাড়া অষ্টসাত্ত্বিক ভাববিকারের প্রায় সব কটি লক্ষণ আমার মধ্যে এত বেশি পরিমাণে প্রকাশ পেতে লাগলো যে, মায়ের উত্তরঙ্গ হাসিতেও নিবৃত্ত হতে চাইছিল না তা। কাচের বোতল (তখন প্লাসটিকের বোতল ছিল না) থেকে পালাক্রমে জল দিয়ে চোখের স্নায়ুবিকলতা বাগে আনার চেষ্টা করা হয়েছিল। তারপর থেকে শান্তিনিকেতন কত বার গেছি। কিন্তু লক্ষ করি, এ যুগের একজন অতি খুঁত খুঁতে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও শান্তিনিকেতনের বর্তমান নিয়ে হা হুতাশ প্রকাশে আমার উৎসাহ হয় না একেবারেই। শুধু আমার নয়, পুরাণো আশ্রমিকদের শান্তিনিকেতন সম্পর্কে অধিকাংশ নীতিমুখর রচনায় বর্তমান নয়, ভবিষ্যৎ-ও নয় — অতীতের একটি স্মৃতি সুরভিত মূর্তিই ভেসে ওঠে শুধু। বিরহের বিষণ্ণতা আর সব স্বরকে ছাপিয়ে ওঠে।

কেন ওঠে? উল্টো দিক থেকে প্রশ্নটা তুললে ভাল হয়। শান্তিনিকেতনের বর্তমান আর ভবিষ্যতের জন্য স্থান এত সংকুচিত কেন? শান্তিনিকেতন শুধু কি অতীতেই থাকবার? হতে পারে ভবিষ্যতকে গড়ে তোলবার জন্য অতীতকে তুলে ধরবার দরকার। সেই অর্থে অতীত চর্চাও হতে পারে ভবিষ্যৎ চর্চারই অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু তবু মনে হয় শান্তিনিকেতন সম্পর্কে অতি প্রয়োজনীয় অতীত চর্চা, অন্তত কিছু পরিমাণেও সামঞ্জস্যহীন। এই সামঞ্জস্যহীনতা, অতীত চর্চার উদ্দেশ্যটিকেও কিঞ্চিৎ বিচলিত করে কি না তার থেকেও জরুরি প্রশ্ন তার সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কিত সত্যটি। জানি না, শান্তিনিকেতনের মতো এমন একটি সম্পন্ন ইতিহাস কোনো কালে কোনো দেশে কখনো রূপ পরিগ্রহ করেছিল কি না। জানি না, পৃথিবীর সর্বকালের নিরিখেই অতুলনীয় রবীন্দ্রনাথের মতো কোনো শিল্পী ঘোষিত শিল্প রচনার এলাকা ছাড়িয়ে শান্তিনিকেতনের মতো একটি গ্রামের শিল্প রূপ রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন কি না। মহাকালের বুকে ভাসিয়ে-দেয়া মহাকবির এও এক সোনার তরী। এক অর্থে রবীন্দ্রনাথ দুটি 'সোনার তরী' কাব্য রচনা করেছিলেন — একটি তাঁর সব রকমের সৃষ্টি; আর একটি — এই শান্তিনিকেতন! যাইহোক, সংশয় ছিল বটে তাঁর, যেমনটি তিনি ওকাম্পোকে বলেওছিলেন একবার, অন্যান্য শিল্প সৃষ্টির তুলনায় শান্তিনিকেতনের স্থায়িত্ব সম্পর্কে। তবু তাঁকে ঘিরে যে ঘনত্বে একটি সম্পন্ন মন্ডলী গড়ে উঠেছিল শান্তিনিকেতনের মাটির প্রতি ইঞ্চিতে, যে বার্তা শান্তিনিকেতন পাঠাতে চেয়েছিল মহাকালের উদ্দেশে, সভ্যতার উদ্দেশে —

যেমনটি বিজ্ঞানীরা পাঠিয়ে থাকেন নাম না জানা গ্রহবাসী সম্ভাব্য প্রাণের উদ্দেশে — তার সৃষ্টিরূপের কি তুলনা আছে কোনো? রবীন্দ্রনাথের কোনো সৃষ্টির তুলনায় তা এতটুকু ঊন কি? সেই জন্যেই কি এর স্থায়িত্ব সম্পর্কে কিঞ্চিৎ সংশয় প্রকাশ করেও এক নিঃশ্বাসেই বলেছিলেন তিনি "আজ যা নিয়ে আছি তা পৃথিবী থেকে ধ্বংস হয়ে গেলেও আমার কোনো কোনো সৃষ্টি বেঁচে থাকবে — তবু আজ যা নিয়ে আছি, তাকে ত্যাগ করে যেতে পারবো না"।

শান্তিনিকেতনের পাঠানো বার্তা শুনেছে কি সভ্যতা, শুনেছে কি স্বদেশ? এর উত্তর দিতে গেলে একটা আস্ত শোক-মহাকাব্য লেখা হয়ে যেতে পারে। তবে এটা ঠিক, শান্তিনিকেতনের বাইরে ঠিক সে ভাবে শান্তিনিকেতন কোথাও নেই। সাহস করে আর একটু বলি। আজকের শান্তিনিকেতনের অভ্যন্তরে সেই শান্তিনিকেতনের তেমন করে না- থাকার কারণও ঐ শান্তিনিকেতনের বাইরে তার বিস্তার না-ঘটা। আর এই ফাঁকটা দিয়েই শান্তিনিকেতনে দেদার ঢুকে যায় দেওঘর, গিরিডি, বক্রেশ্বর, তারাপীঠ। ঢুকছে না কি? যাঁরা বলেন, শান্তিনিকেতন আসলে রবীন্দ্রনাথের সমাধিভূমি, বিশ্বভারতী আসলে বোলপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বুঝতে পারি তার মধ্যে অত্যুক্তি আছে, রবীন্দ্রনাথের শক্তি সম্বন্ধে আছে হয়তো ঘোরতর অচৈতন্য। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, প্রথম যুগের আশ্রমিকরা ছাড়া শান্তিনিকেতনকে ভালবেসে স্বেচ্ছায় সেখানে বাইরে থেকে এসে বাস করছেন— পান্নালাল দাশগুপ্ত বা মার্টিন কেম্পশ্যেনের মতো তেমন লোকের অভাব এখন অবশ্যই সেখানে বর্ধনশীল।

শান্তিনিকেতনের বার্তাটি কী না, যুক্ত হওয়ার, মুক্ত হওয়ার। 'যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে মুক্তো করো হে বন্ধ।' যোগ অবাধ হলো কি না, মুক্তি অগাধ হলো কি না তা দেখবার আগেই একটা গুরুতর অন্য যোগের শিকার হলো শান্তিনিকেতন। সে আর কেউ নয়, অপরিকল্পিত নগরায়ণের থাবার সঙ্গে যোগ। এ বিশ্বযোগ নয় — কিন্তু বিশ্বে বিরাজিত নগরবাদী বিকারের সঙ্গে এক ব্যাপক যোগ।

তার মানে এই নয়, পরিবর্তনমাত্রকে প্রাণপণে প্রতিহত করাই বিশুদ্ধ রাবীন্দ্রিকতা। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত পরিবর্তনও রবীন্দ্রনাথ প্রত্যাশা করবেন না, একথাও বলাই বাহুল্য। যাইহোক, একথা বলা বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে, শান্তিনিকেতন তার বাইরেকে যতো প্রভাবিত করেছে, বাইরের দ্বারা শান্তিনিকেতন নিজে প্রভাবিত তার থেকে ঢের বেশি। তাই, সমাজে বিকল্প জীবনাদর্শ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বস্তুশিক্ষার সঙ্গে ভাবশিক্ষার চর্চা প্রত্যাশিত প্রতিষ্ঠা পায়নি। অথচ সমাজের প্রভাব শান্তিনিকেতনে এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব বিশ্বভারতীতে লক্ষণীয়ভাবেই প্রকট।

এর কারণও স্পষ্ট। ব্যাধির সংক্রামণ সহজে হয়, স্বাস্থ্যের নয়। অপর দিকে, ব্যাধির অপরিণত পর্যায়ে যখন তাকে অপেক্ষাকৃত নিরীহ লাগে তখন তার সম্বন্ধে যথোচিত সজাগতাও সহজে দেখা দেয় না। আগে জানতাম বসন্ত রোগের ক্ষেত্রে শেষের সময়টাই সংক্রামক। এখন উল্টোটা সত্যি বলেই জানছি। মনে হয় সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাধির বিপজ্জনকতা প্রাথমিক স্তরেই বেশি। তা যদি সত্য হয়, তা হলে, ব্যাধির এই প্রকটতর

প্রকাশ পর্বে পুনশ্চ সংক্রামণের আশঙ্কা কম থাকবে অথচ তার বিরুদ্ধে সজাগতার সুযোগ ঘটবে বেশি - এমটা ভাবা যেতে পারে। অর্থাৎ আমাদের তৎপর সতর্কতায় শান্তিনিকেতন অচিরেই ব্যধিমুক্ত হবে এমনটাই আশা করা যেতে পারে।

মনে রাখতে হবে, শান্তিনিকেতনের প্রাণের প্রদীপটিকে দুর্যোগের মধ্যেও অনেকাংশেই সুরক্ষিত থাকতে দেখি তার নিজস্ব ছোট অনুষ্ঠানগুলিতে এবং ঐ স্মৃতিরোমন্থনমূলক চর্চার মধ্যে। বস্তুতঃ বাস্তবের ধুলোমাটি, রোদ-ঘাম এড়িয়ে এই অতীতচর্চার মধ্যেও ভবিষ্যৎকে গড়বারই একটি অবশ্যকৃত্য তাঁরা সম্পন্ন করে চলেছেন বলে মনে হয়। শান্তিনিকেতনের সফলতা-ব্যর্থতার হিসেব কোনো খন্ডকালের চৌহদ্দিতে পূর্ণ হতে পারে, এমনটি ভাবা উচিত হবে না। এই জন্যেই তাঁর সময়কালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনকে অঙ্কুর বলে উল্লেখ করেছিলেন বোধহয়। সেই বিখ্যাত শ্লোকটি স্মরণ করি ঃ

এখনো অঙ্কুর যাহা
তারি পথপানে
প্রত্যহ প্রভাতে রবি
আশীর্বাদ আনে।

অঙ্কুর পল্লবিত হতে অনেকগুলি শর্ত লাগে। পরিবেশের অনুকূলতা তার মধ্যে একটি। শান্তিনিকেতন যে প্রত্যাশিতভাবে পল্লবিত বা বলা ভালো পুষ্পিত হয়ে ওঠেনি তার একটি কারণও ঐ যুগের অনুকূলতার অভাব। বর্তমান যুগ তার শত বিভগ্নতা আর সীমাহীন শূন্যতা দিয়েই শান্তিনিকেতনের প্রয়োজনকে প্রকট করে তুলবে — এই রকম আশা করা যেতেই পারে। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথের মতো অকল্পনীয় রকমের বড় মানুষের মৃত্যুর পরে খুব স্বাভাবিক যে অঙ্কুরকাল আরও পঞ্চাশ-একশো বছর বিরহ-বিকারেই অতিক্রান্ত হবে। তাই, দেখার বাহিরে যিনি চলে গিয়েছেন, তাঁর দিকে আমরা ঐ দশ বছরের শিশুর মতোই ফিরে ফিরে চাইব। কারণ অঙ্কুরকালকে উত্তরণের আপাতত অন্যতম আয়োজন বোধ করি সেটাই। বোধ করি এই চাওয়ার পথ ধরেই তাঁর এই কালো মাটির বাসাটির দিকে বারে বারে ফিরে চাওয়ার অর্থ আমরা ধরতে পারবো। শ্যামল তমাল বন, কিংবা সিক্ত যূথীর গন্ধবেদন নিরন্তর যে বার্তা পাঠাতে থাকবে, নদী-ঢেউ-এর কলরোলে তাঁর চোখের যে আভাস দুলতে দেখবো আমরা, তা হয়তো আমাদের শুধু সিক্তই করবে না আর। ক্রমশঃ উদ্রিক্ত করবে আমাদের কঠিনতম সংকল্পকেও। নতুন সমাজ তথা সভ্যতা সৃষ্টির সংকল্পকে। কারণ, শান্তিনিকেতন বিনোদন-বিলাসের পরপারে গিয়ে, নবীন নন্দন-দৃষ্টিতে নতুন পৃথিবীর ভিত্তি রচনার কাজেই নিয়োজিত হয়েছিল। এই লক্ষ্যটিকে বাদ দিয়ে আচারের অন্ধ অনুবর্ত্তনের দ্বারা শান্তিনিকেতনের স্মৃতিকে আভাসিত করা গেলেও তার প্রাণকে ধরে রাখা যাবে না। সারা পৃথিবী জুড়ে আজ এই একুশ শতকে বিকল্পের সন্ধানে মানুষ যেখানে পৌঁছতে চাইছে, একশো বছর আগে রবীন্দ্রনাথ সেখানেই নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন আমাদের। আজ আমাদের তাই সর্ব শক্তি দিয়েই রবীন্দ্রনাথেরই অনুসরণে বিশ্বজোড়া আয়োজনে যুক্ত হতে হবে নিতান্ত স্থানীয়ভাবেও। তাঁরই অনুসরণে, কিন্তু 'আত্মদীপ'

হয়ে। না হলে তাঁকে অনুসরণ করবার যোগ্যতাই তৈরী হয় না যে!

সৃজনের ত্রিবেণী ঃ সবুজ-সমাজ-সভ্যতা

এই কথাটা উঠেছে যে, শিল্প ছাড়া আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, কৃষির তেমন কোনো ভবিষ্যৎ নেই। সেই জন্যে স্লোগান তৈরি হয়েছে — কৃষি আমাদের ভিত্তি শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ। সন্দেহ নেই, স্লোগানটি বেশ একটু রহস্যময় এবং অস্পষ্ট। অর্থাৎ স্লোগানটি যতটা প্রকাশ করছে, গোপন করছে তার থেকে বেশি।

ভাষার অস্পষ্টতা অবশ্য সম্পূর্ণ পরস্পর বিপরীত কারণেও ঘটতে পারে — যেমন স্বেচ্ছায় এবং অনিচ্ছায়। নিতান্ত অনিচ্ছাবশত নির্দোষ কারণেও যদি অস্পষ্টতা উপস্থিত হয়ে থাকে তবু সেটা স্পষ্ট করাই উচিত। আমরা সকলেই জানি যে, চেষ্টাকৃত কৃষি শুরু হয়েছে যখন প্রায় তখন থেকেই কৃষি ও শিল্পের মধ্যে তৈরি হয়েছে পরস্পর-সাপেক্ষতা। শিল্প না হলে কৃষি যথার্থভাবে এগোয় না, কৃষি না হলে শিল্প মুখ থুবড়ে পড়ে। এই সত্যটা শিল্পবিপ্লব-পূর্ব যুগের পক্ষে প্রযোজ্য যেমন, তার পরবর্তী যুগের পক্ষেও। পার্থক্য একটা ঘটেছেই। পরস্পর-সাপেক্ষতার সার্কিটটা বড় হয়ে উঠেছে শিল্পবিপ্লবোত্তর যুগে। পূর্বে সার্কিটটা ছিল ছোট সীমার মধ্যেই পূর্ণ। পরে সীমাটা বড় হয়ে গেল। ম্যানচেস্টারে কাপড় বোনা হতে থাকলো তো তুলা উৎপাদন হতে থাকলো ভারতবর্ষে। আগে দশ-পনেরোটি গ্রামের মধ্যেই মূলত পূর্ণতা পেত কৃষি, শিল্প ও বাজারের সার্কিটটা। অর্থাৎ শিল্প শুধু ভবিষ্যতেরই আশ্রয় নয়, অবলম্বন ছিল অতীতেরও। কিন্তু সে সব ছিল ছোট শিল্প। সেই জন্যে শিল্প বিপ্লবের মানে এই নয় যে, অতীতে কোনো শিল্প ছিল না। ছিল ছোট শিল্প। সেই অর্থে শিল্প-বিপ্লব আসলে প্রতি-শিল্প-বিপ্লব। পুরনো ছোট ছোট শিল্পকে গিলে ফেলে বড় শিল্পের প্রতিষ্ঠা।

আবার কৃষিকেও কেউ অতীতের স্মৃতি বলতে পারবেন না। এমন কোনো মহা-বিপ্লবের কথা আমাদের কল্পনায় উদিতই হতে পারে না যে, সেই বিপ্লবের পরে ভবিষ্যতে কৃষির আর কোনো দরকারই থাকবে না। তাহলে কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ— এক কথায় কিছু প্রকাশ পায় কি? অতীতে শিল্প ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে — আবার অতীতে কৃষি ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে — এই হল ব্যাপার। সেই জন্যেই সন্দেহ হয়, ঐ স্লোগানটি ভাব প্রকাশের জন্যে রচিত হয়েছে, না, ভাব গোপন করার উদ্দেশ্যে?

সন্দেহ জাগবার আরও মস্ত কারণ এই যে, সাম্প্রতিক অতীতে এই রাজ্যে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি কলকারখানা রুগ্ন অথবা বন্ধ হয়ে গেছে অথচ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেই সেগুলিকে উজ্জীবিত করার। প্রশ্ন হচ্ছে, সেগুলিকে উজ্জীবিত করতে কি শিল্পায়নের পক্ষে থাকা হবে না? সেগুলিকে উজ্জীবিত করার সব বিকল্প পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে কি? শুধু বৃহৎ পুঁজি-নির্ভর শিল্পই কি একমাত্র শিল্প? স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, এই সব প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের পথ যেন চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়ে দৃঢ় এক সিদ্ধান্ত অটল হয়ে

আছেন বর্তমান শাসকবর্গ। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধতা দিয়ে যাঁদের যাত্রা শুরু, পুঁজিবাদের আশ্রয়েই তাঁদের মোক্ষলাভের আকিঞ্চনের মধ্যে যত হঠকারিতাই প্রকাশ পাক, কান পাতলে এর মধ্যে কি এক প্রকার করুণ অসহায়তাও প্রকাশ পায় না? যা প্রকাশ পায় তা যেমন লক্ষনীয়, যা প্রকাশ পায় না তার গুরুত্ব আরও বেশি। যে পুঁজিবাদের বাহ্য বৈভব আমাদের দৃষ্টি কাড়ে, এবং যে -পুঁজিবাদ আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে শিক্ষা, শাসন তথা সমাজের সব ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার জন্য তার সব শক্তিকে নিয়োজিত করেছে, তার আরও একটি দিক আপাতত বিশেষভাবে লক্ষ করা জরুরি। তা হলো তার ক্রিয়াশীলতার বিভঙ্গ। সব কিছুকে বাজার-ব্যবস্থার আদর্শে সন্নিবেশিত করাই তার স্বধর্ম। শেষ পর্যন্ত সে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তেমন একটি আগ্রাসী সমাজ, যে -সমাজ পরিবার ও চিরায়ত সমাজ গঠনের মূল আদর্শকে যাদুঘরে পাঠাতে চায়, তার সংস্কৃতিকে লুপ্ত করে দিতে চায় সর্বতোভাবে। এই সমাজের নাম ব্যবসায়িক সমাজ। রবীন্দ্রনাথ বলতেন বৈশ্য সমাজ। এই সমাজের নিশ্ছিদ্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই বৃহত্তর পুঁজির প্রতি এমন পলকহীন লোলুপতা। 'শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ' কথাটা তাই স্বেচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত ছলনাই হয়ে ওঠে। এর আসল অর্থ — পুঁজি আমাদের ভবিষ্যৎ এবং পুঁজিবাদী ব্যবসায়িক সমাজ-ই আমাদের ভিত্তি। শুধু শিল্পের ক্ষেত্রেই কথাটা স্পষ্ট হয়েছে তাই নয়, কৃষির ক্ষেত্রেও। কারণ, শিল্পক্ষেত্রে সত্যটার প্রতিষ্ঠা ঘটলে কৃষিক্ষেত্রেই বা বাকি থাকবে কেন?

কৃষিতে পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠা ঘটাতে হলে শিল্পায়িত কৃষির পক্ষেই হাওয়া তুলতে হয়। শুধু হাওয়া তোলা নয়, সহজ প্রাকৃতিক কৃষির বিরুদ্ধে প্রতিকূলতাও সৃষ্টি করতে হয়। কৃষি অলাভজনক ব্যবসা — এই শুদ্ধ প্রচারটা যথেষ্ট না হতে পারে, এই সচেতন অনুমান বা অবচেতন সংজ্ঞা থেকেই কৃষিকে অলাভজনক করে তোলবার চেষ্টাও জারি হয়ে যায় পাশাপাশি। সুস্থায়ী কৃষি বা শিল্প কী, সেটি গুরুতর বিবেচনারই বিষয়। অতীতে হাজার হাজার বছর ধরে যে পদ্ধতিতে কৃষি পরিচালিত হয়েছে, তা-ই সর্বাপেক্ষা সুস্থায়ী পদ্ধতি তা বলা যাবে না, যেমন— গত তিরিশ-চল্লিশ বছরের অবলম্বিত পদ্ধতিও যে ভয়ঙ্কর ভুলে তথা অবৈজ্ঞানিকতায় ভরা, তাও আজ প্রমাণিত।

অতীতের কৃষি বা শিল্পের অবলম্বিত পদ্ধতির মধ্যে যত ত্রুটিই থাক, তার প্রধান শক্তির জায়গাটা বোঝা দরকার। যত খন্ডিতই হোক, দুষ্ট হোক আংশিকতা দোষে — সেই শক্তির জায়গাটা ছিল সহযোগিতাই। নতুন দিনে প্রয়োজনের তীব্রতা ও বিনষ্টির আশঙ্কার মধ্যে আরও বেশি করে পুষ্ট করার দরকার ছিল যাকে, এক আশ্চর্য বিপরীত বুদ্ধির কুহকে পড়ে আমরা ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছি তাকেও। এদেশে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে সহযোগিতার আদর্শকে পুষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর অবলম্বিত সমবায় চিন্তা সে আদর্শরই তাত্ত্বিক নিদর্শন। রাশিয়া ও চিনও সে-চিন্তা প্রয়োগের পথে অগ্রসর হয়েছিল অনেকটা। শুধু অবলম্বিত হিংসার কারণেই নয়, আগ্রাসী কেন্দ্রিকতাও সে-চেষ্টার শোচনীয় ব্যর্থতা ডেকে আনে। আসলে, ঐসব দেশে সহযোগিতা বা সমবায়ের আদর্শ প্রকৃতপক্ষে শ্রেণী-প্রতিযোগিতার ঘোষিত এজেন্ডা রূপায়ণেরই উপলক্ষ হয়ে উঠেছিল। উচ্চতর শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছিল যে আন্দোলন, কিছু মানুষের উচ্চতর শ্রেণীতে

ওঠার মধ্যেই স্তব্ধ হলো তার সাফল্য। অস্ত্র-ব্যবসা তথা পুঁজিবাদ-নির্ভর প্রতিযোগিতার আন্তর্জাতিক চাপ, কেন্দ্রীকরণ তথা রাষ্ট্রীয়করণের বাধ্যতাকেই নির্বিকল্প করে তোলে। কেন্দ্রায়িত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সহযোগিতা তথা সমবায়ের আদর্শ নিতান্ত ভাববাদী বিলাসিতা বলে প্রতিভাত হয়। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকান্ডে আঞ্চলিক সংহতির গুরুত্ব বোধের বাইরে চলে যায়। আন্তর্জাতিক অথবা আঞ্চলিক — কোনো ক্ষেত্রেই এতাবৎ কোনো প্রত্যাশাই দানা বাঁধতে পারে নি বিকল্প অথবা বিকেন্দ্রায়নের খোঁজে।

ভিন্নতর পটভূমি

কৃষি অথবা শিল্প — উভয় ক্ষেত্রেই অপেক্ষাকৃত ছোট উদ্যোগ যখন উত্তরোত্তর ব্যর্থই হতে থাকলো এবং পাশাপাশি আরও বৃহত্তর পুঁজি-নির্ভর বিশ্বায়িত ব্যবস্থাই দৃঢ়মূল হতে থাকলো, তখনই বিকল্প সন্ধানের প্রয়োজনীয়তাটা স্পষ্টতর হলো। বিশ্বের পাঁচশোটি বহুজাতিক সংস্থা বিশ্বের আশি শতাংশ সম্পদ হস্তগত করে যখন ধুন্ধুমার কান্ড ঘটিয়ে চলেছে, শোষণ ঘটিয়ে চলেছে প্রকৃতি ও মানব সম্পদের ওপর, তখনই জোরদার হয়েছে সামাজিক উদ্যোগের কথাটা। তার আগে রাষ্ট্রিক উদ্যোগের বাড়-বাড়ন্তের যুগেও কথাটা একটা সুভাষণ রূপে বাতাসে ভেসে বেড়িয়েছিল বটে, কিন্তু তাতে কখনোই সামাজিক উদ্যোগের অপরিহার্যতা প্রতিষ্ঠা পায় নি। এতাবৎকাল রাষ্ট্রিক উদ্যোগেই সমাজ ক্রমশ হীনবল হয়েছিল, করপোরেটায়িত উদ্যোগেই ইদানিং তা প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, বলা যায়।

মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে গিয়ে সমাজ বোধহয় শেষ বারের মতো জীবনের গৌরব অনুভব করতে উদ্যত হতে চায় আজ — অপদস্থ হয়ে যেমন পদস্থতার গৌরব অনুভব করা যায়। ওয়ার্লড্ সোস্যাল ফোরাম আসলে সমাজের আত্মশক্তিতে পুনরুজ্জীবনেরই — বাস্তবতা না হোক — প্রতীক অন্তত। যে- সমাজ হাজার হাজার বছর ধরে চালিয়েছে সভ্যতাকে, প্রধান শর্তই হয়ে উঠেছে তার সুস্থায়িত্বের, — ভিন্নতর পটভূমিতে সহসা জেগে উঠেই সে আজ কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। দীর্ঘ দিন রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের লাঞ্ছনা শরীরে নিয়েও সে কোনোমতে, ক্ষীণ শরীরে, নিজের ন্যনতম ইতি-কর্তব্য সমাধা করে যেত তবু। কিন্তু বিশ্বায়নের কারিগরদের এই "শেষের" দিনগুলিতে সে এমনই মৃতবৎ হয়ে পড়েছিল, জড়তা এতটাই গ্রাস করেছিল তাকে যে, আজ সহসা জাগরণের শিহরণে সচকিত হয়েও সে তার কিংকর্তব্য নির্ধারণ করতে পারছে না। হাতে-পায়ে জোরও পাচ্ছে না।

সে জেগে উঠেই দেখছে 'শিল্প না, কৃষি'র প্রতারণী তর্কে দেশ উত্তাল। কিন্তু সেই ফাঁক দিয়ে চলেছে করপোরেটায়িত কৃষি ও শিল্পের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জোরদার প্রয়াস। শিল্পের ক্ষেত্রে অনেকটা প্রকাশ্যেই। কিন্তু কৃষির ক্ষেত্রে যথেষ্ট গোপনে। যেন সন্তর্পণ অপেক্ষা। কৃষি-ব্যবস্থাটা আর একটু বিগড়ে গেলে তবেই ক্ষুদ্র চাষির পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে কৃষিকাজ এবং তখনই কেবল— যাকে বলে — 'স্বেচ্ছায়' জমি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে চাষিরা। হয়ে যাবে ফেরিওয়ালা বা গৃহভৃত্য অথবা করবে আত্মহত্যা। অপেক্ষা, জল আর একটু ফুরিয়ে যাওয়ার, মাটি আর একটু দূষিয়ে যাওয়ার, কৃত্রিম কৃষি-উপকরণের দাম আর একটু বেড়ে যাওয়ার। তর্ক যেটা

সামনে এল সেটা, সুতরাং তর্কের কোনো বিষয়ই নয়। তর্কের বিষয়টাকে সন্তর্পণে গোপন রাখা হচ্ছে। বিষয়টা আসলে হল — ছোট শিল্প, না বড় শিল্প অথবা ছোট ছোট উদ্যোগে ব্যবস্থাপিত কৃষি, না বড় বড় উদ্যোগে সঞ্চালিত কৃষি।

সামাজিক উদ্যোগ

তর্কের বিষয়েই ঘটছে যখন গোপনীয়তা, নবজাগ্রত সমাজ, জড়তাগ্রস্ত হলেও, খুঁজে নিতে চাইছে তার শক্তি প্রদর্শনের একটি সূচনা-ভূমি। সেই রকম একটি সূচনা-ভূমি বা starting point, যেখানে সমাজের সকলেই যুক্ত হতে পারবেন অর্থবহভাবে। কোন্ সমাজের? মূলত গ্রাম-সমাজের।

রবীন্দ্রনাথ বৈশ্য সমাজ বা (civil society-বলতে যা বুঝি, তা বৈশ্য সমাজেরই কোলে লাগিত তারই অংশবিশেষ।) পাশাপাশি আর এক প্রকার সমাজের কথা বলেছিলেন। সে হোলো আত্মীয় সমাজ। দুই প্রকারের সমাজ-প্রকৃতির পার্থক্যের কথা তিনি বলেছিলেন। সেই পার্থক্যের রকম-সকমকে আরও বিশদ করেছেন অধ্যাপক অম্লান দত্ত।

আমরা সর্বব্যাপী বাজার-ব্যবস্থার অশুভতার কথা বলি, সময়ে সময়ে বুক-ফাটা আর্তনাদের সঙ্গেই। কিন্তু কোথায় সে-ব্যবস্থার কিছুটাও পরিবর্তন সম্ভব, তার কোনো গঠনমূলক চিন্তা আমরা করতে পারি না। চিন্তা করি না, কারণ বাজারবাদী সংস্কৃতির বিপরীত বিকল্প কোনো সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় আমাদের ক্ষীণ হয়ে এসেছে। গ্রামে সে সংস্কৃতির শেষ অবশিষ্টের চিহ্ন হয়তো এখনও রয়ে গেছে কোথাও কোথাও। আমাদের দৃষ্টি নাগরিক কিনা জানি না। কিন্তু তা নিশ্চিতভাবেই যে নগর-পরিবেশ বা সংস্কৃতি-প্রসূত সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। বৈশ্য সমাজের যত গুণই থাক, আত্মীয় সমাজের ওপর তার প্রকৃতির অনিয়ন্ত্রিত এবং আগ্রাসী আরোপ স্বাস্থ্যকর নয় আদৌ। আমরা আত্মীয় সমাজকে দেখি বৈশ্য সমাজেরই দৃষ্টিতে। তার ফলে বাজারবাদী ব্যবস্থাই নির্বিকল্প বলে প্রতিভাত হয় অথচ তার অশুভতার বিরুদ্ধেও মুখর হই পদে পদে।

সময় এসেছে বাজারবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বৃথা বিষোদগার পরিহার করে গঠনমূলক উদ্যোগ-সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার। সেই উদ্যোগ সম্ভব করতে হলে এমন একটা সূচনা-বিন্দু সন্ধান করতে হবে, যার ফলে এক দিকে সমাজের সকলেই অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং অন্য দিকে দুই রকমের সমাজের মধ্যে সম্পর্কের প্রতিষ্ঠাও ঘটতে থাকবে তার পাশাপাশি।

বহুমুখী দুঃসময়ের মধ্যে সম্ভাব্য নতুন একটি সূচনা-ভূমি প্রাপ্তির কথা এবার বলবার চেষ্টা করবো, যা নিঃসন্দেহে সুসময়ের ইঙ্গিতও বহন করে। প্রচলিত সামাজিক উদ্যোগুলিতে সচরাচর দেখা যায় যে, হাজার জনের মধ্যে মাত্র পাঁচ-ছ'জনকে নিয়েই চলছে সেগুলি। প্রাকৃতিক সম্পদ-সৃষ্টিকে ঘিরে হাজার জনের মধ্যে হাজার জনকেই নিয়ে এক প্রকৃত সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণের এক অভূতপূর্ব সুযোগ আজ দেখা দিয়েছে। স্থানভেদে গাছ, মাছ ও পশুপালনের সব ক'টি বা কোনো-কোনোটিকে ঘিরে চলতে পারে এই উদ্যোগ। করপোরেট, রাষ্ট্র

এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি তা পরীক্ষিত হতে পারে। সংঘাতের পথে নয়, সহযোগিতার পথে। সংঘাতে মহাজনদের মহত্ত্ব আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠলেও, সাধারণের মধ্যে দেখা যায়, ইতরতারই সংক্রমণ ঘটে, তার দ্বারা। ইতরতা দৃষ্টির স্বচ্ছতা ও উচ্চতা — উভয়েরই হানি সাধন করে।

ইতিহাসে সামাজিক উদ্যোগের কথাটা তখনই উঠেছে, আগ্রাসী রাষ্ট্রিকতা যখন সমাজের স্বক্ষেত্রকে সংকুচিত করেছে প্রায় সর্বতোভাবে। এই রাষ্ট্রপ্রাধান্যবাদের যুগটা এ দেশে শুরু হয়েছিল ইংরেজের হাত ধরেই। কিন্তু তাঁরা মূলত বিদেশি হওয়ায় সমাজের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের 'সুযোগ' তত ব্যাপক ছিল না তাদের কাছে। স্বাধীনতার পরেই রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হতে থাকে আরও বেশি মাত্রায়। অতীতে গ্রামে সামাজিক শক্তিকেন্দ্রটি জমাট বেঁধেছিল জমিদারতন্ত্রকে ঘিরে। শাসনে-শোষণে জমিদার-তন্ত্র যথেষ্ট বিকৃত হয়ে পড়েছিল বলেই তাকে ভেঙে ফেলবার যুক্তিটা তৈরী হয়েছিল। সেই ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক উদ্যোগের অধুনা উদ্ভাবিত বাস্তবতাটাও ভেঙে পড়ে। কোনো বিকল্পের প্রতিষ্ঠা আর হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ সমাজ-রাজতন্ত্রের কথা বলেছিলেন জমিদারতন্ত্রের পতনের পূর্বেই। কিন্তু চিন্তা সেদিকে অগ্রসর হয় নি। প্রবলতর রাষ্ট্রতান্ত্রিকতার দ্বারাই রাষ্ট্রতান্ত্রিকতার দুর্বলতা দূর করতে চাওয়া হয়েছে! এর ফল হয়েছে মারাত্মক। প্রাকৃতিক সম্পদকে শোষণ করে, মানবিক সম্পদকে বিকৃত করে, দূর দূর শহরের শক্তিকেন্দ্রগুলিতে থাকা মাত্র সামান্য কিছু মানুষের প্রয়োজনেই যে-ব্যবস্থা গড়ে উঠলো, তা একই সঙ্গে আঞ্চলিক ও বিশ্বগত পরিবেশের সংকটকে এমন একটা ভয়ঙ্করতার স্তরে নিয়ে গেল, যা নজীরবিহীন। রাষ্ট্র প্রাধান্যবাদের এই যুগটাই দেশে দেশে প্রতিযোগিতার সূত্রেই ঘটিয়েছে গণরাষ্ট্রবাদের উন্মেষ — যা আজ পৃথিবীর সব থেকে 'সম্ভাবনাময়' ব্যবসাও!

এরই মধ্যে সামাজিক উদ্যোগের কথা আরও জোরের সঙ্গে বলা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক সংকট মোচনের জন্য সমাজের শক্তিকে ব্যবহার করার লক্ষ্যে কখনো কখনো গঠিত হয় সর্বদলীয় সমিতি। সব থেকে বড় কথা, পরিবেশ-সংকটের মোকাবিলায় এসেছে সামাজিক সবুজায়নের প্রকল্প। এই সবুজায়নে যুক্ত থাকে হাজার জনের মধ্যে অন্তত পাঁচ জন মানুষ। সংখ্যাটা বড় কথা নয়। সূচনাটাই বড় কথা। আমরা মনে করি, শুধু সবুজ-ঘটিত আন্দোলনের ক্ষেত্রেই নয়, সমাজ-ঘটিত সব আন্দোলন-সহ স্বয়ং সমাজ-সৃজনগত গভীরতর এবং ব্যাপকতর ক্ষেত্রেও এই নতুন সূচনা-ভূমিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে, যদি তাকে আমরা একটু ভালভাবে সাজিয়ে নিতে রাজি হই। আশা করা যায়, সেই গভীরতর এবং ব্যাপকতর সম্ভাবনার আকর্ষণে আমাদের অন্তর সহজেই সাড়া দেবে। কারণ, ভূতগ্রস্তের মতো গণ-আত্মহত্যার পথে ধেয়ে-চলা সভ্যতার সামনে গণমুক্তির সামান্য সংকেতও গুরুত্ব পাবে বলেই মনে হয়।

কিছু পূর্ব-কথা

কৃষি বা কৃষিকেন্দ্রিক শিল্পের দ্বারা মানুষকে আর বেশি কিছু দেবার নেই এমন একটা হাতাশাবোধ

থেকেই বৃহৎ পুঁজি-নির্ভর বৃহৎ শিল্পের প্রতি একরোখা উন্মুখতা সৃষ্টি হয়েছে, সন্দেহ নেই। এই হতাশার কারণটাকে আগে বোঝাবার চেষ্টা করতে হবে। হাতাশার নিরসনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যেই সেটা জরুরি। নতুন সূচনা-ভূমির ব্যবহারের যৌক্তিকতাটা তখনই স্পষ্ট হবে।

অধুনা-প্রচলিত কৃষি-পদ্ধতিটি, আমরা অল্প অল্প করে বুঝতে পারছি, চরম বিজ্ঞানসম্মত কিন্তু সাধারণ কান্ডজ্ঞানের অভাবপীড়িত। রাসায়নিক উপকরণের অতি-ব্যবহার সে অভাবের একটি নিরীহ দিক মাত্র। বিজ্ঞানসম্মত কৃষির নামে কৃষির বৈচিত্র্য বিলোপই হল প্রধান কথা। প্রথমত, কৃষি বলতে বোঝাল মূলত স্বল্পমেয়াদী কৃষিকেই। দীর্ঘমেয়াদী কৃষিকে ফরেষ্ট্রির অন্তর্ভুক্ত করেছিল ইংরেজরা। মূলত দুটি কারণে। এক, অতি জ্ঞান। দুই, অজ্ঞানতা। অতি জ্ঞানের প্রভাবে তারা বুঝেছিল দীর্ঘমেয়াদী কৃষিকে তাদের দেশের অনুকরণে ফরেষ্টি নাম দিলে সরকারীকরণের থাবাটাকে অনেকটাই সম্প্রসারিত করা যাবে। সেই লক্ষ্যে সারি সারি হাজির হলো রিজার্ভড ফরেস্ট, রেস্ট্রিক্টেড ফরেস্ট, প্রোটেক্টেড ফরেস্ট প্রভৃতি। দ্বিতীয় কারণটি প্রভাব বহু ব্যাপক। স্থান-কাল-পাত্রোচিত কান্ডজ্ঞানের অভাবই শীতের দেশের অনুকরণে স্বল্পমেয়াদী কৃষিকেই এ দেশের একমাত্র কৃষি বলে চালাতে চায়। শীতের দেশগুলিতে যে ক'মাস সূর্যালোকের প্রতুলতা ঘটে সেই সময়ই হৈ হৈ করে স্বল্প মেয়াদের ফসল ঘরে তুলে নিতে হয়। কিন্তু আমাদের মতো গরমের দেশে সারা বছরই একই মেয়াদে নানা বিচিত্র মেয়াদের বিচিত্রতর সব ফসল ফলতে থাকে। যে দেশের যা সম্পদ তাই নিয়েই তাদের কাজ করতে হয় — এই সাদা কথাটা ইংরেজদের জানবার তত দরকার ছিল না; আর, আশ্চর্যের কথা, আমাদেরও দেখছি প্রয়োজনটা কতকটা একই রকমের।

এত দূর পর্যন্ত এসে আমরা এই কথাটা অন্তত বুঝতে পারবো যে আমাদের দেশের কৃষি আসলে বিচিত্র প্রকৃতির, বিচিত্র মেয়াদের। এখন জৈব কৃষির প্রয়োজনীয়তার কথা নানা মহল থেকে উঠে আসছে। সরকারের তরফ থেকেও তার কথা বলা হচ্ছে। যারা কৃষি-তত্ত্ব বোঝেন, তাঁরা এই কাথাটি স্বীকার করবেন যে, জৈব-কৃষির পক্ষেও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রকমারি ফসলের চাষ। কৃষির ছোট পরিবেশের রক্ষায় যেমন— পরিবেশের বিশ্বগত সুরক্ষার জন্য আর্ত পৃথিবীর পক্ষেও তেমন, যেটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তা হলো — দীর্ঘ মেয়াদী গাছেরও চাষ। কৃষির স্বাভাবিক ছন্দে সেই চাষের বাস্তবতাটা জাগিয়ে তুলতে পারলেই আজকের পৃথিবীর বিচিত্র প্রয়োজন নানা দিক থেকে মিটতে পারে। স্থানীয়ভাবে এবং বৈশ্যিকভাবেও।

সমস্যা এখানেও যা দেখা দিতে পারে তা হল, স্বাভাবিক জিনিসকে গ্রহণ করতেও আমাদের স্বভাব সহজেই দ্বিধান্বিত হয়ে পড়তে পারে — যদিও গ্রহণের যে যুক্তি তৈরী হয়েছে তার বিরোধীতা করা এ ক্ষেত্রে কঠিন হতে পারে। এই রকম একটি ক্ষেত্রে, যেখানে অভ্যাসগত জড়তাই মূল বিঘ্নটা উপস্থিত করে, স্বতন্ত্র একটা ব্যবস্থাবুদ্ধির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। সেই ব্যবস্থাবুদ্ধিটি কোনো তাক্ লাগানো যান্ত্রিক প্রযুক্তি তত নয়, যতটা একটি সহজ সামাজিক প্রযুক্তি (social engineering) গাছ, মাছ ও পশুপালনের প্রাথমিকতা এবং এ সবের উপজাত দ্রব্যের সুরক্ষা, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনের ব্যাপারকে ঘিরে চলতে পারে এই নতুন কর্মকান্ড।

সামাজিকভাবে সেই কর্মকান্ড গড়ে তোলা সহজ এবং স্বাভাবিক। কারণ যুগ যুগ ধরে চলে আসা কৃষি এ শিল্পের চর্চায় কাজ করেছিল সে সহজের ছন্দ। সভ্যতার শুরু কৃষিকে ঘিরেই। সে-সভ্যতার মূলে ছিল সহযোগিতারই ছন্দ। সেই ছন্দকে নতুন যুগের উপযোগী করে আমাদের একটু সাজিয়ে নিতে হবে। আবার বলি, গণ-আত্মহত্যার পথে ভূতগ্রস্তের মতো ধেয়ে-চলা এই সভ্যতা প্রবল বিপরীত আবেগে যখন গণমুক্তিরই পক্ষাপাতী হয়ে উঠবে কিছুটাও, তখনই, আবার বলি — অন্তত কিছুটাও — সহজ হয়ে আসবে নতুন করে সাজিয়ে নেওয়ার সে পথ।

সহযোগিতা

সহযোগিতার পিছনে থাকে একটা মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধ নাগরিক এবং গ্রাম বা আত্মীয় সমাজ — উভয়তই ক্রিয়াশীল। দুই ধরণের সমাজে ক্রিয়াশীল সহযোগিতায় প্রকৃতির মধ্যে কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। প্রধান স্বাতন্ত্র্য — প্রথমটির ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রয়োজনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা, দ্বিতীয়টির দ্বারা বহু প্রয়োজন সাধিত হলেও প্রীতির ভূমিকা অগ্রগণ্য।

আমরা সকলেই জানি, মানুষ যখন কাপড় বুনতে পারতো না তখন তার পরিধান ছিল গাছের পাতা অথবা ছাল কিংবা পশুচর্ম। কাপড় বুনতে শেখাটা ছিল যুগান্তকারী আবিষ্কার। এই বুননটা সম্ভব হয় টানা-পোড়েনের সাহায্যে — বিপরীতের মিলনে। সভ্যতার ইতিহাসে সুদীর্ঘকাল আত্মীয় সম্বন্ধের 'টানা'-র ভিত্তিতেই চলেছিল সমাজ, ব্যবসায়িক সম্পর্কের 'পোড়েন' তার মধ্যে যুক্ত হয় নি যথাযথভাবে। তখন যেন এক পায়ে চলেছিল সভ্যতা। শিল্প বিপ্লবের সমতালেই বিকাশ ঘটলো বাজার-কেন্দ্রিক পুঁজিবাদের। পূর্বে বাজার ছিল নিতান্ত আংশিকতায় আবদ্ধ, শিল্প-বিপ্লবোত্তর যুগে তা-ই হয়ে উঠলো সর্বগ্রাসী। এমনই সর্বগ্রাসী যে, আত্মীয় সম্বন্ধের সামর্থ্যকে সে সুচ্যগ্র মেদিনীও ছেড়ে দিতে চায় না আর। ক্রমে ক্রমে এমন হল যে, সব সম্বন্ধকেই সে সাজিয়ে নিতে চায় ব্যবসায়িক সম্বন্ধেরই ভিত্তিতে। আবার যেন শুরু হলো সভ্যতার সেই এক-পায়েই চলা — বাঁ পা ছেড়ে ডান পায়ে।

আমাদের প্রত্যাশা, সভ্যতা, কখনোই যা পারে নি ঠিকমতো, এবার তার দুই পায়ে চলার সামর্থ্য অর্জন করুক। আমাদের বিশ্বাস, প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক সম্পদকে ঘিরে দুই-পায়ে চলার প্রয়োজনীয় পরীক্ষার এক দুর্লভ সুযোগ উপস্থিত হয়েছে মানুষের সামনে। ব্যবসায়িক সম্বন্ধের সর্বগ্রাসিতায় প্রকৃতির যে-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে বা ধ্বংস হয়ে চলেছে অপ্রতিহতভাবে, তার পূরণ অথবা রোধ ঘটতে পারে যেমন, তেমনি সবুজ ইত্যাদি সৃজনের ছুতোয় সভ্যতাকেও আরও একবার সাজিয়ে-নেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। সর্বসাধারণের সাহায্যে — সম্ভবত তুলনাহীন প্রবলতায়।

এই সৃজন-চেষ্টার সব থেকে বড় বাধা নাগরিক সমাজেরই সর্বশক্তিমত্তা যেমন, আবার তার সহায়ও তেমনি সেই সমাজেরই মুক্তচিন্তা। সমস্যা শুধু এইটুকুই যে, ঐ শক্তির আচার এবং মুক্তির চিন্তা সংখ্যাধিক্যের কাছে পরস্পর-সহযোগী যতটা, স্ববিরোধিতায়-ভরা সম্ভবত তার থেকে বেশি। সেই জন্য নাগরিক সমাজ

থেকেই সব করণীয়টুকু সম্পন্ন হবে — এমন মনে করাটা ভুল। দেশের ৭০ শতাংশ গ্রামময় হলেও দেশের ৮০ শতাংশ উচ্চাসীন রাজনীতিজীবীই নগরজাত। নাগরিক সংস্কৃতি সমস্ত গ্রাম-দেশের ওপরেও সে রাজনীতির মডেলটি চাপিয়ে দেয়, তার মুখ্য ফলটা পায় নগর-ই। সেই জন্যে দেশের প্রায় ৬০০টি জেলার মধ্যে নগর-প্রধান ৫০টি মাত্র জেলার উন্নতি হয় চরম তৎপরতায়। বাকিরা থাকে তাদের সেবাদাস হয়ে। বড়র সেবার অধিকার পাওয়া হয়তো গৌরবেরই ছিল। কিন্তু অসম-উন্নয়নের সুযোগ নিয়ে তা আজ ধ্বংসেরই পথ প্রশস্ত করে চলেছে, প্রচার করে চলেছে তারই আদর্শ, তাকে কেবলই বড় বলে দেখা — পূর্ণত না হলেও — অংশত অমূল-প্রত্যক্ষণ-ই।

গ্রামের আত্মীয় সমাজকে যদি অধিকতর প্রাকৃতিক সম্পদ সৃষ্টি করে ব্যাপকতর ব্যবসায়িক সম্পর্কও রচনা করতে হয়, লাভ করতে হয় উভয় সমাজেরই অর্জনীয় সামর্থ্য, তাহলে,— আমাদের বুঝতে পারতেই হবে — সহযোগিতা ও সামঞ্জস্যই হবে গ্রাম-সমাজের পক্ষে অনুসরণীয় নির্বিকল্প পথ। তাবৎ ক্ষেত্রসহ ব্যবসায়িক ও মানব-সম্বন্ধের মধেও। কমার্স ও // -এর মধ্যেও।

আমরা অনেক সময়ই ইংরেজকে গালি দিয়ে বলে থাকি যে, বিভক্ত করে শাসন করাই ছিল তাদের অবলম্বিত শয়তানিপূর্ণ নীতি। কথাটা ঠিকই, আবার সর্বাংশে ঠিক নয়, শুধু ইংরেজ নয়, কেন্দ্রায়নবাদী যে-কোনো শক্তিরই আপন কর্তৃত্ব বিস্তার তথা রক্ষার জন্যই প্রয়োজন হয় বিভেদ সৃষ্টির। দলগুলি রাষ্ট্রক্ষমতা দখলেরই দাবিদার। কোনো-না-কোনো আমরা অথবা তোমরার দখলদারি নিয়েই বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষমতার কেন্দ্রে অথবা কাছে পৌঁছনোর পথটা প্রশস্ত করে। দলগুলির ওপরের স্তরে পরস্পরের মধ্যেকার সম্পর্ককে দেখলে বোঝাই যায় না যে, নিচের স্তরে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কটা দাঁড়িয়েছে পরস্পর যুদ্ধরত প্রতিবেশী দুই দেশের মানুষের মতো। ইতিহাসের এই পর্বে দলাদলিটা যে একটা কদর্যতম সংযোজন হয়ে উঠলো, তার কারণ, আদিম গোষ্ঠীবাদের মধ্যে হিংসা, ঈর্ষা ও সন্দেহের যে আদ্যাশক্তি কাজ করে, দলবাদ তারই আশ্রয়ে লালিত। ধর্মকে দিয়ে যেমন সমাজে সহযোগিতার পরিবেশ-সৃষ্টি প্রায় অসম্ভব, দলকে দিয়েও তাই। প্রাকৃতিক সম্পদের সৃষ্টি, সুরক্ষা বন্টন — প্রভৃতি ব্যাপারে একমাত্র দলগত প্রচেষ্টা তাই যথেষ্ট হতে পারে না। দল-বিশেষের উদারতা তার স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতাকে যদি অতিক্রমও করে যায়, তাহলেও সমাজে সামগ্রিক সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা তার পক্ষে অসম্ভব হবে। অন্য দলের পবিত্র কর্তব্য হবে বিরোধী দলের উদার আয়োজন-মাত্রকেও ব্যর্থ করে দেওয়া!

সকলের জন্য প্রকৃতিজাত সম্পদ

আমাদের প্রধান প্রস্তাব এই যে, আমাদের রাজ্যে প্রতিটি গ্রামবাসী নিঃসম্বল মানুষই পেতে পারে দশটি করে বড় গাছ, দশ কেজি করে মাছ এবং পরিবার-পিছু একটি বা দুটি করে পশু সম্পদ। কিন্তু সমাজে সহযোগিতার পরিব্যাপ্ত মহড়া ছাড়া এই সম্পদগুলির অর্জন অসম্ভব। যে বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ গ্রামবাসী গরিব মানুষের

আয়ত্তের অতীত হয়ে গেছে, তাদের নাগালের মধ্যে আনার দ্বারাই সৃজনের এক মহাত্রিবেণীসঙ্গম ঘটতে পারে — সবুজ সৃজনের পথেই অন্যতম সমাজ তথা সভ্যতারও সৃজন ঘটাতে পারে। কিন্তু তার জন্য সমাজে চাই স্বতন্ত্র একটি মঞ্চ। সমন্বয়ই হবে যার প্রধান কাজ — প্রাকৃতিক সম্পদের সৃজন হবে যার অতি-প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক কাজ।

স্বতন্ত্র মঞ্চ

স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে নির্মাণ ছাড়া কোনো মঞ্চ স্বতন্ত্র হয়ে উঠতেই পারে না। ঘোষিত আদর্শের পার্থক্যই মঞ্চ-বিশেষকে স্বতন্ত্র করে না। তাদের গঠন ও পরিচালনের প্রকৃতিও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের প্রস্তাবিত স্বতন্ত্র মঞ্চটির গঠনতন্ত্র হতে পারে নিম্নরূপ ঃ

ক) তা ওপর থেকে চাপানো বড় থেকে ছোট হবে না। নিচে থেকে গড়ে ওঠা ছোট থেকে বড় হবে।

খ) মঞ্চের গ্রামীণ একক-টি খুব বড় বা ছোট কোনোটাই হবে না। পাঁচশো থেকে পনেরশো মানুষকে নিয়েই গঠিত হতে পারে সেটি।

গ) উদ্দিষ্ট মানুষের সকলেই হবেন মঞ্চের সদস্য।

ঘ) মঞ্চের একটি কার্যকরী সমিতি থাকবে, যার সদস্যেরা নির্বাচিত হবেন সর্বসম্মতিক্রমে। সমিতির একজন পতি নির্বাচিত হবেন একই পদ্ধতিতে।

এভাবে সূচী আরও দীর্ঘায়িত করবার দরকার হবে। কিন্তু গভীরভাবে অনুভব করতে হবে চতুর্থ ক্রমসংখ্যার বক্তব্যটি, যেখানে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচনের ওপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখনকার পরিবর্তনশীল পর্যায়টায় আমরা দেখতে পাই সমাজ পরিচালিত হচ্ছে একাকার তত্ত্বের আবেগের ভিত্তিতে, ঐক্য-তত্ত্বের আদর্শের ভিত্তিতে নয়। ঐক্য-তত্ত্বে বৈচিত্র্য স্বীকৃত। ভারতবর্ষের সাধনার নিজস্ব পথ সেটাই। বিচিত্রের মধ্যে যোগের পথটাই তার অন্বিষ্ট। একাকার-তত্ত্বের পিছনে যে-আবেগ কাজ করে তা হিংসা ও অধৈর্যের দ্বারা চালিত। আজকের গণতন্ত্র বা দলতন্ত্র একাকার-তত্ত্বের লজিকের দ্বারা লালিত বলে বিরোধিতা-মাত্রকে সে বৈরিতা বলে মনে করে। তাই ওপরের দিকে এখনও বিরোধীদের স্বীকার করার ঠাঁটটা বজায় থাকলেও, নিচের দিকে মতগত বিরোধ বা দ্বিমতের মধ্যে সম্পর্কের জায়গাটা সীমাহীনভাবে সংকুচিত। গণতন্ত্রের সুতিকাগার পঞ্চায়েতের হাজার হাজার পদে কিংবা কলেজে কলেজে ছাত্র-সংসদের অসংখ্য পদে বিরোধীরা তাই প্রার্থীই দিতে পারে না। বাম শাসনে যা দেখা গেছে, পরিবর্তনের আমলে তারই অনুসরণ। এইভাবে জয়ের সংবিধান-সম্মত নাম নাকি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়! দলতন্ত্র যে গণতন্ত্রের সমাধিভূমিতে পরিণত হতে পরে, আমাদের দেশে তা অনেকেই উল্লেখ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, মানবেন্দ্রনাথ, জয়প্রকাশ নারায়ণ — এ দেশীয় মনীষার উচ্চতম চূড়াগুলির সকলেই গণতন্ত্রের নির্দ্বিধ পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু তার সঙ্গে দলতন্ত্রের যোগটাকে প্রয়োজনীয় মনে করতেন না।

গণতন্ত্রের ভিত্তি কিছুতেই হতে পারে না যেন-তেনভাবে জড়ো করা জনসংঘট্ট। পরিবারই তার প্রকৃত ভিত্তি। কিন্তু পরিবারে সে-গণতন্ত্র ৫১ঃ৪৯-এ বিভক্ত থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় না। গ্রহণে-বর্জনে বহু-মতের বিরোধ ও মিলনেই গঠিত হয় তা। পরিবারের যে কোনো কেউ — বেশি ক্ষেত্রে বয়স্ক কেউ — মধ্যস্থ হয়েই গড়ে তোলেন যে মত-সমবায়। বিকার ও বিঘ্নের দৃষ্টান্তের অভাব না হলেও। পদ্ধতিটা সমাজের সম্প্রসারিত ক্ষেত্রে অনাচরিত বলে তাকে অলীক বা আজগুবি বলে ধরে নেওয়াটা ভুল। স্পষ্ট যাকে চেনা যায়, অব্যবহিতভাবে অনুভব করতে পারা যায় যার সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য— কেবল তারই মতের মূল্য থাকতে পারে কোনো নেতার কাছে। কোনো বিশেষ দলপতির ঔদার্যের ঘটনা এক-একটা বহুমান্য ব্যতিক্রমই। সেটা নিয়ম নয় বলেই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ'-এ বলেছিলেন, "আমরা দল করিয়া বাঁচিব না।" বলেছিলেন, "এক্ষণে আমাদের সমাজপতি চাই।"

আসলে পরিবার-বৃত্তের মধ্যে লালিত পদ্ধতির দ্বারাই গণতন্ত্রের মৌল ভিত্তিকে শোধন করে নিতে হবে। এখানে স্মরণ করতে হবে সেই আত্মীয় সমাজেরই আদর্শকে, যেখানে হাজার হাজার বছর ধরে টিকে-থাকা সমাজের ঐতিহ্যের শক্তিকে গ্রহণ ও তার সম্ভাব্য বিকারকে শোধনের প্রক্রিয়া একই সঙ্গে চলতে পারে। দলতন্ত্রের আদর্শটা মাত্র সেদিনের ইয়োরোপের কাছ থেকে পাওয়া। ওটা যে মহাকালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একটা ব্যবস্থা, তা বলা যাবে না। উল্টোদিকে সেটা যে নানা দিক থেকে ইতিহাসে একটা কদর্যতম সংযোজনই হয়ে গেল, তাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আপাতত প্রাকৃতিক সম্পদ সকলের নিজে নিজে অর্জনের প্রশ্নটার সামনে দাঁড়িয়ে দেখা যাক, ঐ দলতন্ত্রটা শুধু অপ্রয়োজনীয় নয় — প্রকৃতি ও প্রাণের পক্ষেও অত্যন্ত ক্ষতিকর। সেই জন্যে গাছ, মাছ, পশু সম্পদ এবং এ সবকে ঘিরে যে শিল্পের আয়োজন — এসব প্রত্যাশিতভাবে গড়ে তুলতে, সকলের সদিচ্ছা ও সহযোগ সঠিকভাবে আকর্ষণ করতে, সকলের সম্মতিতে নির্বাচনের কোনো বিকল্প দেখা যায় না। অন্তত সমাজের তৃণমূল স্তরগুলিতে। পরিবারের বা সমাজের শীর্ষে তিনিই স্বাভাবিকভাবে বসে যান, যাঁর চোখে আলো আছে। বিকার কখনও কখনও সেক্ষেত্রেও ঘটে বটে, কিন্তু জাগ্রত চৈতন্য তার শোধনও করে নিতে পারে, এমনটা রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল। সমাজ-রাজতন্ত্রে তিনি ব্যক্তির ভূমিকাটিতে খুব জোর দিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন, একটি মানুষকে ঘিরেই সমাজের ঐক্য দেখতে দেখতে জমে ওঠে। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা তাঁর *স্বদেশী সমাজ* গ্রন্থে রয়েছে। পান্নালাল দাশগুপ্তকেও সাধারণভাবে সমাজ-রাজতন্ত্রী বলা যায়। তিনিও ব্যক্তির ওপরেই জোর দিয়েছেন। তাঁর ভাবনা-চিন্তা নামক বইতে তিনি 'এক'-এর ওপরেই জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঐ 'এক'-টি না থাকলে হাজারো শূন্যেরও কোনো মানে নেই। কিন্তু একের পিঠে শূন্য যদি বাড়াতে থাকি তাহলে তার পরিমাণের বৃদ্ধি ঘটে। আসল কথা, সর্বসম্মতিক্রমের বাস্তবতা একক ব্যক্তিমানুষের সততা ও সৌন্দর্যের শক্তিকে উন্মোচিত করে আরও বেশি। তা একটি ব্যক্তিত্বকে ঘিরে যে বিভূতি বিকশিত করে তোলে, আর সব কিছুর সঙ্গে সকল মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ সৃষ্টিতে তার সম্ভাবনাটাকে আমাদের একটু একটু করে বুঝতেই হবে আজ। মূল্যবোধের মূলধন মূল্যের পরীক্ষাতেও, 'সকলের জন্য

অর্থনীতি'-র প্রতিষ্ঠাতেও মান ও হুঁশ-যুক্ত সমাজপতির গুরুত্ব অনেক বেশি কার্যকরী হবে বলে মনে করি, নানা চাতুর্যের সাহায্যে সামনে এসে-যাওয়া দলপতির চেয়ে। এই সমাজপতিকে ঘিরেই যথার্থ ভাবে জমে উঠতে পারে সম্প্রসারিত পরিবার তথা সমাজ-মঞ্চ।

অবরোহী বনাম আরোহী

সদ্য শীর্ষবিন্দুতে ওঠা কেন্দ্রায়নবাদী সমৃদ্ধি-যুগের একটি পেলব বিশ্বাস এই যে, যা-কিছু ভালো তা ওপর থেকে নিচেই সঞ্চারিত হবে। চুঁইয়ে-যাওয়া পদ্ধতিতে। তেমন যুগের প্রান্তে এসে আজ আমরা সহসা দেখতে পাচ্ছি মহামৃত্যুর পদচ্ছায়া— ফুরিয়ে-যাওয়ার করুণ ছবি। দেখতে পাচ্ছি, কয়েক হাজার জন মানুষের হাতে বিশ্বের ৮০ শতাংশ সম্পদ কেন্দ্রীভূত, আর ৭০০ কোটি মানুষের জন্য বরাদ্দ ২০ শতাংশ মাত্র সম্পদ।

অর্থাৎ দেখা গেল জল নিচের দিকে গড়ায় নি। আমাদের সকলের জন্য সবুজের আন্দোলন নিচে থেকে ওপরে ওঠার সম্ভাবনা-বিষয়ক। কঠিন মনে হতে পারে সে কাজ। পুরনো ব্যবস্থায় সুবিধাভোগীদের বাধার থেকেও বড় বাধা জনচৈতন্যের জড়তা। বনস্পতি-শিরে সহসা উদিত অগ্নিকেতুর মতো শত তরঙ্গে ধেয়ে-আসা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা অনুভব করবো হয়তো প্রাণেরই গৌরব। তখন সহজ হতেও পারে আজ যাকে কঠিন মনে করছি,তার বাস্তবায়ন।

তবে; বিররীত ক্রমে, জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে ওপরেও একটু ওঠে বটে, কিন্তু সে সামান্যই। ভালভাবে ওঠে— যখন বাস্পীভূত হয়। সে শুধু সূর্যের উপস্থিতিতেই ঘটে। ব্যক্তি-বিশেষের সঙ্গে সূর্যের তুলনা করবো না। কিন্তু একথা খুব জোর দিয়েই বলতে পারি যে, 'বহু জনতার মাঝে' 'অপূর্ব একা' মানুষগুলিকে সমাজের মাঝে স্থান দিতেই হবে আজ। তাঁদেরই ব্যক্তিত্বের বিভূতির আকর্ষণেই ছোট ছোট গ্রামগুলি আবার জেগে উঠতে পারে - গুণগত পরিবর্তন ঘটতে পারে তাদের অবস্থার।

খুব বেশি পরিবর্তনের দাবি আমরা করছি না। আমরা যা আশা করছি খুব সংক্ষেপে বললে তা এই রকম ঃ

১) তিন মাসের কৃষিতে এখনও যে ভাগ চাষের প্রথা চালু আছে, তাকে তিন বা তিরিশ বছর মেয়াদ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা। তার জন্যে যে-যে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন বলে মনে হবে, তার রূপায়ণে আন্তরিক হওয়া। এই ব্যাপারটি ঘটলে পরিবেশ-বান্ধব সুস্থায়ী কৃষির প্রতিষ্ঠা ঘটবে।

২) লক্ষ কোটিপতিদের সঙ্গে মন্ত্রী-আমলাদের সমন্বয় করে চলার 'ঐতিহাসিক বাস্তবতার' মধ্যে, গ্রামের মধ্যে থেকে-যাওয়া খুব-গরীব আর কম-গরীব মানুষের মধ্যেও সমন্বয়ের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার কাজকে 'ঐতিহাসিক বাস্তবতা' বলে স্বীকার করা। অর্থাৎ শ্রেণী-সংঘাত প্রত্যাহার করে সমন্বয় যখন হচ্ছে, সেটা ভালভাবেই হোক। ওপরে-নিচে সর্বস্তরেই। ঐতিহাসিক বাস্তবতার পিছনে ধাবমান মাননীয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নিন্দেমন্দোয় কোন কাজ হবে না। অনিন্দনীয় পথটা ধরাই জরুরী।

৩) এই সমন্বয় সাধনের জন্যে একটি অনুঘটকের সাহায্য নেওয়া। এই অনুঘটক হল পূর্বোক্ত স্বতন্ত্র মঞ্চ, যা

জমির মালিক ও ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্কটাকে জোরদার করবে। এবং মঞ্চের নির্দেশে নিযুক্ত সক্রিয় কর্মীমন্ডলীর জীবিকায় প্রতিষ্ঠা ঘটবে, যার ফলে প্রতি হাজার মানুষকে নেওয়া সমিতিতে ৫০ থেকে ১০০ জন পর্যন্ত মানুষের কর্মলাভ সম্ভব হবে। এবং লাভ হতে পারে অন্য এক জীবন!

৪) জৈবকৃষির প্রয়োগ বাড়ানো। তার সহায়ক-সংস্কৃতি — কৃষিবৈচিত্র্য, সুরক্ষা-ব্যয়ের হ্রাস, সকলের অর্জনের স্বাভাবিকতা সৃষ্টি।

৫) ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কৃষির যে ধরনটি এখন কাজ করছে, তাকে একেবারেই বিচলিত না করে, মাত্র অব্যবহৃত এবং অপব্যবহৃত জায়গাগুলিকেই সামাজিক ব্যবস্থায় স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি চাষের ব্যবস্থা করা। যা মোট কৃষির দশ থেকে কুড়ি শতাংশের বেশি হবে না।

৬) সামাজিক পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থায় মালিক, মধ্যস্থতাকারী ও শ্রমিক — তিন পক্ষের প্রাপ্তির পরিমাণ, সর্বসম্মতিক্রমে প্রকাশ্যে ঠিক করা। স্থান-ভেদে কিছু পার্থক্য থাকতে পারে পরিমাণ নির্ধারণে। সামাজিক ব্যবস্থাপনায় লাগানো ১০টি গাছের মালিক হবেন সব থেকে কম শ্রম বা অর্থ দিতে পারবেন যে শ্রমিক যার একের তিন তিনি পাবেন একের তিন মঞ্চ এবং একের তিন মালিক। ধানের জমি, পতিত জলাভূমি বা নদী প্রভৃতির অব্যবহৃত অংশে সামাজিক পদ্ধতিতে, যে মাছ চাষ হবে, তারও বন্টনবিধি হতে পারে একই রকম। এইভাবে এই আন্দোলনের ফলে গ্রাম-সমাজের সবাই একই সঙ্গে পেতে পারবেন। কিন্তু শহুরে রাজনীতি এটা দিতে পারবেন না। দেবে সম্পর্কের শক্তি ও শিল্পরূপ!

৭) অবশিষ্ট প্রচলিত পারিবারিক কৃষিতে বা ক্ষুদ্র চাষে প্রাকৃতিক সার ও কীটনাসক সরবরাহ করে ও সুরক্ষার ব্যবস্থাপনা করে মঞ্চ কিছু আয় করে নেবে যেমন — তেমনি সঠিকভাবে সামাজিক সুরক্ষাপ্রাপ্ত পারিবারিক কৃষিও নতুনভাবে সুযোগ পাবে বিপুলভাবে পুনরুজ্জীবিত হওয়ার।

৮) সকলের জন্য সবুজের এই আন্দোলন, সূচনায় শুধু স্কুল পড়ুয়াদের জন্যেই লক্ষ্যবদ্ধ হোক, পরে স্বাভাবিক নিয়মেই সেটা সকলের জন্য হয়ে উঠবে, শিক্ষার বিস্তারেও তা অভূতপূর্ব ভূমিকা পালন করবে। এই আয়োজন খাদ্যের বিনিময়ে অধুনা-প্রচলিত রোমহর্ষ সৃষ্টিকারী শিক্ষার পরিবর্তনেও কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে। একশো দিনের কাজকে কীভাবে ব্যবহার করা সুন্দর হবে, সে ব্যপারে স্বতন্ত্র আলোচনাই জুরুরী।

৯) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণেও বৃক্ষবন্টনের বিষয়টিকে পরিকল্পনামতো সাজানো যেতে পারে। তাতে সরকার যে কাজে বিশেষ কিছুই করতে পারে না, সমাজের সেখানে কিছু করবার শক্তির পরিমাণ যে কত স্পষ্ট হবে। নিয়মটা হতে পারে, প্রথম সন্তানই পিতামাতার মতো ন্যূনতম ১০টি গাছই পাবে - দ্বিতীয় বা তৃতীয় সন্তান পাবে বাবা মায়ের ভাগ থেকেই।

১০) অর্থের মধ্যস্থতায় বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে সরাসরি বস্তু-বিনিময়ের যে বাস্তবতা, অল্পস্বল্প হলেও, আজও টিকে আছে — তার পরিমাণকে আরও কিছুটা বাড়ানোই হবে এই সব উদ্যোগের একটা অন্যতম

ফল। সভ্যতার ইতিহাসে সেটার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু আছে বা নেই — মুক্তমনে তার পরীক্ষার জন্য সাধারণকে তৎপর করে তোলা। শুধু বাজারকে গালি দেওয়ার, বিফলতা ত্যাগ করে বাটার বা বস্তুর সরাসরি লেনদেনের সম্ভাবনাকে উদ্ঘাটন করাই শ্রেয়।

১১) সামাজিক সুরক্ষা বিচিত্র কৃষিকে সম্ভব করবে, বিচিত্র কৃষি কম জল লাগে এমন সব চাষের পরিমাণ বাড়াবে। তাছাড়া, সামাজিক সুরক্ষার সুব্যবস্থার দ্বারা জল কৃষিতেও সমৃদ্ধি ঘটবে। তখন চাষি নিচু জমিকে বা সেই জমির একাংশকে জলধারণের কাজে লাগাবে জল কৃষিরই প্রয়োজনে। এইভাবে জল ধারণের ফলে মাটির তলা থেকে জল তুলে বিক্রি করার পরিবর্তে বৃষ্টির জল ধরে রেখে ছোট ছোট চাষিই প্রয়োজনমতো পরস্পরের মধ্যে বিক্রি বা বিনিময়ের সুযোগ পাবে। জল সমস্যার সমাধানে এই প্রক্রিয়াটির ভূমিকা হতে পারে চমকপ্রদ।

এই রকম নানা বিষয়ে প্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটাতে পারে সকলের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ সৃষ্টির এই পরিকল্পনা।

বর্তমান লেখক মনে করেন, যা বলা হয়েছে বা বলবার চেষ্টা করা হয়েছে, এই নিবন্ধে তার পক্ষে এবং বিপক্ষে, বিস্তারিত আলোচনা হওয়া অত্যন্ত জরুরি। বাঙালি গালি-গালাজ ছাড়া প্রায় রা কাড়তে ভুলে গেছে। ছোট ছোট উদ্যোগে গঠিত অত্যন্ত সাধারণ একটি কর্ম-পরিকল্পনা বিষয়ে মুখ খোলার সুবাদে গঠনমূলক একটি বিতর্ক শুরু হোক। আশা করা যায়, প্রয়োজনীয় গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে দিয়ে এবং অবশ্যই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে আলোচ্য জটিল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের একটা পথ স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

মালিক, আত্মীয়সমাজ ও মজদুরের নয়া তেভাগা আন্দোলনেই মূর্ত হতে পারে উন্নয়নের মানবিক মুখ

রাষ্ট্রবাদী বা বিশ্বায়নবাদী উভয়েই আজ পরস্পর মুখাপেক্ষী। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে উভয়েই এমন একটি সমাজপ্রযুক্তি প্রত্যাশা করে যাতে করে সকলেই যথাসম্ভব রাষ্ট্র ও কোম্পানি-নির্ভর হয়ে ওঠে, জনসাধারণের নিজেদের মধ্যে পরস্পর-নির্ভরতা লুপ্ত হয়ে যায়, সকলেই প্রতিটি পদক্ষেপে যাতে বাজার নির্ভর হয়ে ওঠে। প্রান্তবর্তী সব মানুষের দারিদ্র মোচনেরও সেটাই যেন একমাত্র পথ, নির্বিকল্প আশ্রয়!

পরস্পর-নির্ভরতা লুপ্ত করে বাজার-নির্ভরতা সৃষ্টির কাজে জ্ঞানত বা অজান্তে সহায়তা করে দল। দল — সে একদলীয়, দ্বিদলীয় বা বহুদলীয় যে ব্যবস্থারই প্রতিনিধি হোক — কোম্পানির সেবায় আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য হয়, কোম্পানির প্রসাদ পাওয়ার জন্য কাতর হয়ে থাকে। এইভাবে দল, বা দলগুলি চিরাচরিত সমাজের বুকে ভিন্ন এক সমাজের প্রতিষ্ঠা ঘটাতে সাহায্য করতে থাকে। পূর্বেই যাকে বলা হয়েছে ব্যবসায়িক বা বৈশ্য সমাজ।

ব্যবসায়িক সমাজ ও চিরাচরিত সমাজ (আত্মীয়সমাজ)— দুই সমাজের প্রকৃতি অভিন্ন নয়। তাদের

শক্তিকেন্দ্রও পৃথক। ব্যবসায়িক সমাজের শক্তিকেন্দ্র নগর, আত্মীয় সমাজের শক্তিকেন্দ্র পরিবার। ব্যবসায়িক সমাজবর্তী মানুষের পরস্পরের মধ্যেকার সম্পর্কের সূত্র হচ্ছে বৈষয়িকতা। আর আত্মীয় সমাজের ক্ষেত্রে আত্মীয়তা। ব্যবসায়িক সমাজে আত্মীয়তা নেই তা নয় — থাকলেও আছে অপ্রধান হয়ে। তেমনি আত্মীয়সমাজের ক্ষেত্রেও বৈষয়িকতা থাকলেও তা থাকে অপ্রধান হয়ে। ব্যবসায়িক সমাজের নিয়ন্ত্রী শক্তি হল রাজনীতি, আর, আত্মীয়সমাজের, ধর্ম। রাজনীতি ও ধর্মের মধ্যে এইখানেই মিল ও অমিল। তথা দুই কালের ধর্ম ও রাজনীতি দুই সমাজের নিয়ন্ত্রীশক্তি হলেও দুই সমাজে এবং দুই অপব্যবহার, এক অনপ্রনেয় বাস্তবতা। এই দুই শক্তিকে উৎপাটিত করা চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য 'সব ধর্মের প্রতি সমান বিশ্বাস'-এর চাতুর্যেও নিরসন হবে না সসস্যার। যেটা হতে পারে, তা হলো, দুয়েরই সংশোধন, দুয়েরই উত্তরণ। এর জন্য পশ্চিমী রাজনীতির দাস-সুলভ অনুকরণ যেমন 'অকর্তব্য' হবে, তেমনি অনুচিত হবে ধর্মের অর্থহীন। /// অতীত মুখী আচার সর্বস্ব অংশের অনুসরণ। ধর্মের একটি শুদ্ধ তথা আধ্যাত্মিক রূপ আছে যা আমাদের কাছে হয়ে উঠতে পারে পরম আশ্রয়। উনিশ শতকের যে চার জন সহস্রাব্দের সেরা মানুষ-রূপে চিহ্নিত হতে পারেন, তার তিন জনকেই জন্ম দিয়েছে এই সোনার বাংলা। এরা সকলেই ধর্মের সেই অব্যাত্ম তথা বিশ্বরূপের উদ্ঘাটনেই নিবেদিত ছিলেন। এঁরা কেউই পশ্চিমী রাজনীতির অন্ধ অনুকরণের পক্ষপাতীও ছিলেন না। তাঁদের পথের অনুসরণেই আমরা আজ চলতে পারি আত্মদীপের আলোয়।

যাইহোক, সমস্যা হচেছ বৈষয়িকতা, ব্যতিক্রম বাদ দিলে, আত্মীয়তাকে রেয়াত করে না। সমাজ, পরিবার কিংবা ব্যক্তির প্রসারিত আত্মবোধ খান খান হয়ে ভেঙে পড়লে ব্যবসায়িক সমাজের সুবিধে হয়। ওই সমাজ তার অর্থ ও সংস্কৃতি নিয়ে তাই সেই ভাঙনের পোষকতাই করে।

রাষ্ট্র ও বিশ্বায়নবাদিতার দোসর দলও তাই সমাজকে ভাঙে। পরিবারকে ভাঙে ওই সমাজের দেওয়া সস্তা সুখবাদ ও নানা আকর্ষণ। এ সবেরই সামগ্রিক ফল পরিণামে বিধ্বস্ত হয় ব্যক্তির শুদ্ধ আত্মবোধ। ব্যবসায়িক সমাজের প্রধান সম্পদ শুদ্ধ আত্মবোধ নয়, সীমাবদ্ধ অহং বা ছোট আমি।' আর আত্মীয়সমাজের সম্পদ, অসীম অহং বা 'বড় আমি।' 'ছোট আমি' ও 'বড় আমি'-শব্দ দুটি উচ্চারণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অন্য প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণও। তাঁর উচ্চারণে তা তীক্ষ্ণতর হয়ে দেখা দেয় যথাক্রমে 'কাঁচা আমি' ও 'পাকা আমি'।

আবু সঈদ আইয়ুব লিখেছিলেন, 'অ্যামিবা থেকে দেবতা পর্যন্ত যে বহু-বিসর্পিত রেখা চলে গেছে, ঐতিহাসিক মানুষ তারই মাঝে একটি পরিমিত আয়তন, কিন্তু কোনো দিকেই সীমিত নয়। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে দুই আমিই আছে — পরস্পর আশ্লিষ্ট হয়ে। একটি দেহগত সীমার দাবি নিয়ে, আর একটি আত্মগত সম্ভাবনার ইশারা নিয়ে। একটি মৃত্যুকে ঠেকানোর ফন্দি উদ্ঘাটনে; অন্যটি মহান প্রপিতামহদের ভাষা ধার নিয়ে বললে, আপন 'আনন্দরূপ অমৃতের' উদ্ভাসনে।

ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, দল — প্রভৃতির এক একটি বা একাধিককে ঘিরে দ্বন্দ্ব আজ হয়েছে তীব্র। এর মূলে

আছে দুই আমির অসংগতি। এই অসংগতিকে আবার তীব্রতর করেছে আত্মীয় ও ব্যবসায়িক সমাজের মধ্যে সংগতির অভাব। দুই সমাজের অসংগতির তালে তালেই কেটে গেছে আজ দুই 'আমি'র সম্পর্কের ছন্দ। এই ছন্দহীনতার অসৌন্দর্যই আজকের এই সামাজিক তথা প্রাকৃতিক সঙ্কটের মূলে।

ব্যবসায়িক সমাজের দোষটা সব থেকে বেশি হলেও আত্মীয়সমাজের মধ্যেও ছিল ব্যাধির বীজ। যত প্রাথমিক ও স্বল্পাকারেই হোক, আত্মীয় বা চিরাচরিত সমাজের বুকেই দেখা দিয়েছিল আধিপত্যবাদের আদি ব্যাধি বা 'ছোট আমি'র আগ্রাসিতা। মুখোমুখি মানব-সম্বন্ধের নিভৃতি হয়তো এনেছিল কিছু স্নিগ্ধতা, প্রতিষেধক হয়েছিল আগ্রাসিতার। কিন্তু তাকে উন্মুলিত করতে পারেনি। চূড়ান্ত উন্মুলন হয়তো অসম্ভব অথবা অবাস্তব। চিন্তায় যাঁরা চরমোৎকর্ষবাদী, তাঁরা হয়তো সেই উন্মুলনেরই স্বপ্ন দেখেন। যে অহং সৌন্দর্য বিকীর্ণ করে সামঞ্জস্যে ও সুষমায়, তাকেও হয়তো সন্দেহযোগ্যই মনে করে তাঁদের খুঁতখুঁতে মন। 'বড় আমি'র সৌম্য সম্প্রসারণও হয়তো আকর্ষণ করে না তাঁদের অনুরাগী দৃষ্টিকে।

আত্মীয় সামাজিক চৌহদ্দিতে আধিপত্যবাদের উল্লেখযোগ্য উন্মূলন প্রয়াস দেখি মধ্যযুগের বৈষ্ণব আন্দোলনের মধ্যে। যদিও এক অন্যরকম আধিপত্যবাদেরই হাত ধরে, গুরুবাদের, অবতারবাদের মোড়কে। কৃষ্ণের অবতার স্বয়ং চৈতন্য, কথাটা এখানে সযত্নে লক্ষণীয়!

'আমারে ঈশ্বর মানে — আপনাকে হীন/তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন'। — এই কথাটাই এখানে বুঝে নিতে হবে যে, আত্মীয়সমাজের সীমাবদ্ধতা থাকলেও, সম্ভাবনাও তার অসীম। তাই শ্রীচৈতন্য আধিপত্য বা অবতারবাদের অনুসরণে নিজে ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে ভক্তকেও সমান আসনে বসাতে পারেন। বৈষ্ণব মহাজনেরা মনে করতে পারেন; 'দুঁহুঁ দোহাঁ হোয়'। অর্থাৎ ভক্ত ও ভগবান দুজনই দু'জনের মতো। এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে আমায় দেখ!

দেখা যাচ্ছে, দুই সমাজই তাদের সীমা ও সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতার সামনে উপস্থিত। অথচ এক এক সমাজের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিক্রিয়াটা, এক এক সময়, একদিকেই ঝুঁকে পড়ে। আঠারো এবং উনিশ শতকে চিরাচরিত সমাজের বিরুদ্ধে বিমুখতা না থাকলে ব্যবসায়িক সমাজেরই দূত ইংরেজদের এদেশে প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা সহজ হত না। আবার, ঈশ্বর গুপ্তের সময় থেকেই ব্যবসায়িক সমাজের 'বেলেল্লাপনার' বিরুদ্ধে 'গেলো গেলো রব' লেগেই আছে। আজ পরিবেশ সঙ্কটের সূত্রে, ধিক্কার বেড়েছে সহস্র গুণ। কিন্তু কোন পথে প্রশমিত করা যাবে তার ক্ষতিকরতা, প্রতিহত করা যাবে তার ভয়ঙ্করতা, সে ব্যাপারে চিন্তা অগ্রসর হয়নি প্রত্যাশিত পরিমাণে।

রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ প্রমুখ মহাজনেরা যথোচিত পরিমাণেই শুরু করেছিলেন চিন্তা। কিন্তু সেই পরীক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি। তত্ত্ব বা পদ্ধতির দিক থেকে তাই আমাদের চিন্তা যান্ত্রিক থেকে গেছে — সৃষ্টিমূলক হয়ে ওঠেনি। ফলে তাঁদের মতকে অনেক দূরবর্তী বা চরমতাধর্মী বলে মনে হয় আজ।

রবীন্দ্রনাথ যে সমাজ-রাজতন্ত্র বা গান্ধীজি যে গ্রামস্বরাজের কথা বলেছেন, তা আজ গ্রহণযোগ্য অথবা সার্বিক বা আংশিকভাবে গ্রহণযোগ্য কিনা, তা প্রথমত বিচার্য। দ্বিতীয়ত বিচার্য, ধাপে ধাপে, ধীর অথচ ধারাবাহিকভাবে, গ্রহণের ভিন্নতর কোনও পদ্ধতি আবিষ্কার করা যায় কি না।

লক্ষণীয় এই যে, প্রথম বিচার কিছুটা এগোলেও দ্বিতীয় বিচারটি এগোয়নি ততটা। পরস্পর বিপরীত সিদ্ধান্ত করে আমরা কেউ বলেছি গান্ধি-রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ-অরবিন্দ এ যুগের পক্ষে অচল, কেউ বলেছি, অতীব প্রাসঙ্গিক। কেউ বলেছি, আংশিকভাবে প্রাসঙ্গিক। কিন্তু দ্বিতীয় বিচারটি এগোয়নি বলে তাঁরা কোন পদ্ধতিতে কতখানি আজ গ্রহণযোগ্য হতে পারেন বা পারেন না, তা স্পষ্ট হয়নি। ফলে এই সব মহাজনদের বাণী অতীতের কুহেলিতেই আবিষ্ট হয়ে থেকেছে, বর্তমানের বাস্তবতায় ঝলমল করে ওঠেনি। দ্বিতীয় বিচারটি শুধু পদ্ধতিগত দিক নিয়েই সীমাবদ্ধ নয়। সেই পদ্ধতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি দর্শনও। তাকে সমন্বয়ের দর্শন বললে যথেষ্ট বলা হবে না। তাকে কান্ডজ্ঞানের দর্শন বললেও অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে। তাকে প্রয়োগবাদী বললে আরও একটু স্পষ্ট হয় হয়তো।

একটি নতুন পদ্ধতিতে বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়িক সমাজ ও ক্ষয়িষ্ণু আত্মীয়সমাজের মধ্যে সংগতির একটি সূত্র অনুসন্ধানের জন্যই একটি মঞ্চের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সব রকমের দ্বৈততার মধ্যে একটি সেতুর মতো কাজ করবে বলে এই মঞ্চকে মধ্যস্থতাকারী মঞ্চ অথবা সমাজে আত্মীয়তার শক্তিকেও উদ্বোধন করা এর উদ্দেশ্য বলে একে আত্মীয় সমাজ-মঞ্চ নাম দেওয়াও যেতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আত্মীয়তা এবং আর্থিকতা - উভয়ের মিলনে এক অন্যতর জীবনের অধিকার লাভই এই সমাজ মঞ্চের লক্ষ্য। কোনো অতীতমুখী আচ্ছন্নতা নয়।

এই মঞ্চ সব রকমের দ্বৈততা বা বিরোধী শক্তিসংঘের মধ্যে মধ্যস্থতার কাজ করলেও, প্রধানভাবে কাজ করবে, আগেই বলা হয়েছে, ব্যবসায়িক ও আত্মীয়সমাজের মধ্যে মধ্যস্থতার। পাঁচশো থেকে পনেরোশো মানুষকে নিয়ে। পরীক্ষা করবে গ্রামে গ্রামে সম্পদ সৃষ্টি ও তার বন্টনের সৌকর্য সৃষ্টিতে ব্যবসায়িক ও আত্মিক সম্পর্কের যৌথতার সম্ভাবনাকে। এই পথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক সর্বাতিশয়ী হয়ে উঠতে পারবে না। পিছিয়ে পড়া, পরিত্যক্ত ও প্রান্তবর্তী মানুষদের উত্তরোত্তর পিছিয়ে পড়া বন্ধ হবে। কর্মহীন হাতও যে অনন্য এক সম্পদ, আত্মীয় সম্পর্কের জাদুস্পর্শে তা আবার, অন্তত কতকটাও অনুভূত হবে। বস্তুত, কর্মহীন অসংখ্য হাতের সম্পদমূল্য বোঝার ক্ষেত্রে বাধা উপস্থিত হয়েছিল বলেই লালগড়, গোর্খাল্যান্ড, কামতাপুর আন্দোলন জনসমর্থন পেতে পেরেছে।

মধ্যস্থ এই আত্মীয়সমাজ মঞ্চ রাষ্ট্রীকরণ, সামাজিকীকরণ বা কোম্পানিকরণের পথে না গিয়ে ক্ষুদ্র কৃষি ও শিল্পকেই করবে পুষ্ট, সরবরাহ করবে তার সহযোগী সমাজপ্রযুক্তি, উদঘাটন করবে তার বিচিত্র সম্ভাবনা। এভাবে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত সম্পদ শহরে বা শহর বিশ্বে প্রেরণের বা প্রক্রিয়াকরণের কাজ কীভাবে হলে ব্যক্তিগত

কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না তার সতর্কতাও হবে এই মঞ্চের অন্যতম কাজ। এইসব গুরুতর কাজ যাতে স্বল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হয়, তারই জন্যে আংশিক সামাজিক উদ্যোগের প্রস্তাব এবং সকলের সাহায্যে বাড়তি উৎপাদন করে মধ্যবর্তী মঞ্চ কর্তৃক তার একটি অংশ গ্রহণের প্রস্তাব।

মালিক, মঞ্চ ও মজদুর - এই তিনের মধ্যেই অর্থাৎ সকলের মধ্যেই বঞ্চিত হবে ওই আংশিক সামাজিক উদ্যোগের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য বা অর্থ। এভাবে নয়া তেভাগা ব্যবস্থা প্রক্রিয়াটি হতে পারে সুস্থায়ী ও স্বয়ংচালিত এবং বিপুল সম্ভাবনাময়। এই প্রক্রিয়ায় হাজার জনকে নিয়ে গঠিত সমাজের কাজে মধ্যস্থ মঞ্চের পঞ্চাশ থেকে একশোজনের ঘটতে পারে পূর্ণকালীন কর্মনিযুক্তি। জৈবকৃষি, তার সহযোগী বিচিত্রকৃষি পশুপালন যথার্থভাবে প্রচলিত হলে এবং শুধুমাত্র অব্যবহৃত বা অল্প ব্যবহৃত সরকারি বারোয়ারি বা ব্যক্তিগত জল বা স্থলক্ষেত্রে সামাজিক উদ্যোগে যদি মাছ ও গাছের প্রত্যাশিত চাষের ব্যবস্থা হয়, তাহলে প্রত্যেক ভূমিহীন দিনমজুরও, ছোট বড় মিলিয়ে লাভ করতে পারে অন্তত চল্লিশটি করে গাছ। লঙ্কা, বেগুন, লাউ, কুমড়ো থেকে বড় বৃক্ষও প্রধানত ফলের। প্রত্যেকে পেতে পারে বছরে দশ কেজি মাছও। সেই সঙ্গে সকলেই পেতে পারে প্রায় বছরজোড়া কাজের প্রতিশ্রুতি। এভাবেই গড়ে উঠতে পারে সবুজের সুস্থায়ী সুরক্ষা ব্যবস্থা, নতুন সবুজ সমাজ।

এর জন্য নতুন কিছু চাই না। শুধু তিন মাসের কৃষিতে প্রচলিত আছে যে ভাগ চাষের প্রথা, তাকে তিন বা ত্রিশ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত করা চাই। তা করতে সমাজে সম্প্রসারিত করা চাই সহযোগিতা ও সম্প্রীতির একটি সৌম্য বাতাবরণ। গোষ্ঠীবাদ তা দিতে পারবে না। ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, লিঙ্গ, ভাষা, দল - প্রভৃতি কোনও গোষ্ঠীকে ধরেই তা লভ্য হবে না। স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীকে ধরেও না।

স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ধরে যে হবে না, তার দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। প্রথমত, তারা ধার নেওয়ার ক্ষেত্রে সমবায়ের নিয়মকে কাজে লাগাতে পারলেও উৎপাদনে তার শক্তিকে তেমন কাজে লাগাতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, যেখানে গোষ্ঠীর মধ্যে আংশিকভাবেও পেরেছে সমবায়ের আদর্শকে কাজে লাগাতে, গোষ্ঠীর বাইরে ডেকে এনেছে সংঘাত। এভাবে যৌথ উদ্যোগে দুটি একটি পুকুরে মাছ চাষ সফল হওয়ার পর তৃতীয় বা চতুর্থ পুকুরটি করায়ত্ত করতে গিয়ে গোষ্ঠীগুলি অন্য গোষ্ঠী বা ব্যক্তি মাছ চাষির সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছে। পুকুরে বিষ দেওয়াটা হয়ে উঠেছে প্রতিপক্ষকে হাত গোটাতে বাধ্য করার মোক্ষম অস্ত্র। এ পথ সমবায় ও সম্প্রীতির প্রকৃত পথ নয় - সন্ত্রাসের পথ। এ পথে কেউ কেউ কিছু দিনের জন্য গুছিয়ে নিলেও সকলের মঙ্গলের পথ এটা নয়। তৃতীয়ত, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীতে গ্রামের সব থেকে গরিব মানুষের স্থান প্রশস্ত হয়নি। হয়েছে মাঝারি গরিবদের।

সেই জন্যে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলিকে উৎপাদনশীল করার লক্ষ্যে সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য চাই স্বয়ম্ভর সবুজ সমাজ বা আত্মীয়সমাজ মঞ্চের মধ্যস্থতা। যা স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর বিরোধী নয়, বরং তার পরিপূরক পরের ধাপ। নয়া তেভাগা আন্দোলনের দ্বারা স্বয়ংচালিত হতে না দিলে দল বা দেশি-বিদেশি নানা সংস্থার অতি অধীনতা তার প্রকৃত কার্যকারিতা নষ্ট করবে - 'আমরা-ওরা'কে উত্তীর্ণ হয়ে সকলকে স্পর্শ করার শক্তি হারাবে। পরিবেশজনিত এবং অসাম্যজনিত - দুই সমস্যার সমাধানেই এই প্রচেষ্টা বহু সুফল প্রসব করতে পারে। শুধু

পরিবর্তন নয়, আনতে পারে - নবজাগরণ।

সরকারের দিশাহারা কৃষিনীতিই গ্রামীণ সমাজের সর্বনাশ করেছে

পশ্চিমবঙ্গ আজ এক মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন। গত বত্রিশ বছর টানা চলছে বামফ্রন্ট সরকার। এর মধ্যে বড় কোনও অশান্তি ছিল না, বিরোধীরাও প্রায় অস্তিত্বহীন। এককথায়, ছিল চূড়ান্ত উন্নয়নের অফুরন্ত অবকাশ। টানা তিন দশক একটি রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়া একটি সরকারের আদর্শ বাস্তবায়নের পক্ষে ছিল এক সুবর্ণ সুযোগ।

বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখতে পাই পশ্চিমবাংলার পিছিয়ে পড়ার গল্প। শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য পরিষেবা সব বিভাগেই প্রগতিশীলতা অধোগতির দিকেই। বামফ্রন্টের ব্যাপক ব্যর্থতা রাজ্যে রাজ্যে তাদের অগ্রগতি তো ঘটালোই না, উলটে পশ্চিমবঙ্গকে এক মহাবিপর্যয়ের দিকে নিয়ে গেল। যে একটা ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট নিঃসন্দেহে কৃতিত্ব দাবি করতে পারে - সেই ভূমিসংস্কারের সুফল পাওয়া সত্ত্বেও। আজ মাওবাদী বলা হচ্ছে যাঁদের, তাঁরা কি এতদিন 'আমাদের লোক' ছিলেন না? সমগ্র গ্রামবাংলাই আজ এতখানি বিমুখ কেন বামফ্রন্টের প্রতি? কী ছিল তাঁদের কৃষি নীতিতে? কৃষিসংশ্লিষ্ট সমাজপ্রযুক্তিতে?

ভূমি সংস্কার কংগ্রেসেরই গৃহীত নীতি। কিন্তু তার দ্রুত প্রয়োগের ব্যাপারে কংগ্রেসের একটা দ্বিধা ছিল। সিপিএম ছিল দ্বিধামুক্ত। তাদের মাথায় ভালো করে ছিল ভোটের অঙ্কটা। ঊর্ধ্বসীমার ওপরে জমি ছিল যাদের, তাদের সকলের বিরুদ্ধেই সিপিএম সমান খড়্গহস্ত ছিল না। মাঝারি মাপের জোতদার, যাদের সংখ্যাই ছিল বেশি, তাদের একটা বড় অংশের সঙ্গেই সিপিএমের গড়ে ওঠে পারস্পরিক প্রত্যুপকারের সম্পর্ক। সেই সুবাদে জোতদারদের অনেকেই সুযোগ পায় ঊর্ধ্বসীমার অতিরিক্ত জমি লুকিয়ে রাখতে। এবং তারা সিপিএমের দীর্ঘস্থায়ী সমর্থকে পরিণত হয়।

বর্গা সম্পর্কিতঅংশটাই গ্রামবাংলাকে দখলে রাখার আশ্চর্য শক্তি দেয় সিপিএমকে। বর্গা যে পুঁজিপতিদের দেওয়া একটি কৃষি-সমাজপ্রযুক্তি, এটা জানাই যথেষ্ট নয়। জেনে রাখা ভালো, ওই প্রযুক্তি রাশিয়া থেকে আসেনি, এসেছে আমেরিকা থেকে। আমেরিকান সেনানায়ক ডগলাস ম্যাকার্থারের উপদেষ্টা উল্‌ফ লাজেনস্কির দেওয়া প্রযুক্তিতত্ত্ব এটা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এটা প্রথম প্রযুক্ত হয় জাপান ও তাইওয়ানে, চিনের আদলে ভূমি-অভ্যুত্থান ঠেকাতে। কিন্তু এই তথ্যটুকু জানার পরেও কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ অংশটাই থেকে যায় অগোচরে। যে দেশ থেকেই আসুক, প্রযুক্তিটা মানুষের মঙ্গলকারী বলেই সিপিএম বা বামফ্রন্ট তাকে প্রয়োগযোগ্য মনে করেছে। ভূমি-বন্টনে বাম সরকারের কৃতিত্ব তথ্যের সমর্থন দাবি করতে পারে না। তথ্য বলে যে, বাম আমল পর্যন্ত

১। শ্যামল কুমার মিত্রের চিঠি, দৈনিক স্টেটসম্যান (২৯.৪.১১)

উদ্ধার হওয়া সিলিং বহির্ভূত খাস ঘোষিত উদ্বৃত্ত ১৩ লক্ষ একর কৃষিজমির ৮৫.৫৪ শতাংশ অর্থাৎ ১১.১২ লক্ষ একরই উদ্ধার হয়েছে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে[১]। অর্থাৎ পূর্বেই উদ্বৃত্ত হিসেবে চিহ্নিত ১.৮৮ লক্ষ একর কৃষি জমি ৩৩ বছরের বাম শাসনে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে মাত্র। অথছ সিলিং বহির্ভূত উদ্বৃত্ত কৃষিজমির পরিমান ৩৫ লক্ষ একরেরও অনেক বেশি[২]। অর্থাৎ আরও অন্তত ২২ লক্ষ একর কৃষি জমি উদ্ধার ও বন্টন সম্ভব ছিল, যে-সম্পর্কে বাম সরকারের ঔদাসীন্য স্পষ্ট।

মোট ১ কোটি ৪৩ লক্ষ ৬৩ হাজার ৭২৮ একর কৃষিজমিতে বর্গা রেকর্ড সংখ্যা কত? ১৫,১৩,১৩৬ জন মাত্র। এর মধ্যে আবার বর্গা উচ্ছেদের সংখ্যা ৪.৫৩ লক্ষ। প্রায় কোটি জন ভাগ-চাষীর মধ্যে এত স্বল্প সংখ্যক নথিকরণে এত 'ভালো' কৃষি-সমাজ প্রযুক্তির পরিকল্পনা শুধু কয়েক পা এগিয়েই থেমে থাকলো না, প্রত্যাহৃত হতে থাকলো!

কিন্তু ভালো প্রযুক্তির এমন হাস্যকর আংশিকতার রহস্যটা কী? কেবল তেরো শতাংশ জমি বর্গা-নথিভুক্ত করেই অতর্কিতে এটি পরিত্যাক্ত হল কেন সেই কর্মসূচী? তাহলে কি বর্গা সম্পর্কিত প্রযুক্তিটিকে সিপিএম চাষির পক্ষে কল্যাণকর মনে করে না আর? অথবা কল্যাণকর মনে করলেও চাষির পক্ষে আর কোনও কল্যাণকর্ম তারা করতে চায় না? সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের অনেক আগেই কি তবে কৃষি ও কৃষক বিরোধিতা শুরু করেছিল তারা?

বর্গা নথিভুক্তিকরণ কৃষি ও কৃষকের উন্নতির সঙ্গে একেবারেই যুক্ত নয়। পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় কৃষি ও কৃষকের 'উন্নতি' লক্ষণীয় মাত্রাতেই ঘটেছে, কিন্তু তা ঘটেছে বর্গা প্রথা চালু না করেই। তাহলে পশ্চিমবঙ্গে বর্গা প্রথা চালু করার উপযোগিতা কোথায়? বিশেষত তার আংশিক প্রয়োগের?

মনে রাখতে হবে, রাজনীতিতে যেটা কাজের লক্ষ্য বলে মনে হচ্ছে সেটা আসল লক্ষ্য নাও হতে পারে। হতে পারে আসল লক্ষ্যটা একেবারেই আলাদা।

কী হতে পারে সে আলাদা লক্ষ্য বর্গা নথিভুক্তিকরণকে বাম সরকার ভোট লাভের জন্যই ব্যবহার করেছে।

ব্যবহার করেছে এক নিঃশব্দ ভয়ের উপলক্ষ্য রচনার মাধ্যমে। লক্ষ করতে হবে যে, কোনও কোনও সিপিএম কর্মী সমর্থকের জমি বর্গা প্রায় হয়নি। হয়নি, যাতে ভুল সংকেত না যায় তার জন্য। সিপিএম করলে জমি বর্গা হয় না, এটা জানাবার দরকার ছিল। আবার, সেটা জানানোই যথেষ্ট নয়। নথিভুক্ত জমির চাষিদের দ্বারা মালিকদের 'উপদ্রুত' করা হল। সেই অল্পসংখ্যক চাষি সামাজিক উপদ্রবটা কত দূর যেতে পারে, তা কেবল সময়ে সময়ে পরিমিত আকারেই দৃষ্টান্ত তারা দেখাতে থাকল। কিন্তু সব চাষি নথিভুক্তির সুযোগ পেল না। কেন? বর্গা নথিভুক্তির দ্বারা চাষিদের ভালো করাই যদি একমাত্র লক্ষ্য হত, তাহলে তা না করে কি থাকতে পারত বাম সরকার?

২। তদেব

আসলে, বর্গার খাঁড়া দেখিয়েই ছোটখাটো অসংখ্য সব ভূমি মালিককেই বশীভূত করে রেখেছে সিপিএম দীর্ঘদিন। রেখেছে, গ্রামেরই গরিব চাষির দ্বারা। এভাবেই প্রস্তুত হয়েছে খুব গরিব আর কম গরিব মানুষের মধ্যে সম্পর্কহানির এক প্রশস্ত ক্ষেত্র, দিশাহারা গৃহযুদ্ধের আয়োজন। এই সম্পর্কহানি সম্পদহানিরও কারণ হয়েছে। অর্থাৎ দারিদ্রসৃষ্টিরও কারণ হয়েছে। কাজে কাজেই গঠিত হয়েছে দরিদ্রের দ্বারা দরিদ্রের শত্রু সৃষ্টি এবং তার দ্বারা পুনশ্চ দারিদ্রসৃষ্টির প্রহেলিকাময় পাপচক্র।

দারিদ্রসৃষ্টি কেন? কারণ দারিদ্রের সহনীয় স্টিমের সদ্ব্যবহারই ভোটযন্ত্রের প্রধান শক্তি। এই'শক্তি' লাভের প্রয়োজনেই গ্রামে গ্রামে উধাও হয়েছে রকমারি ফসলের আলপনা, ঘরে ঘরে দেখা যাবে না প্রাণিসম্পদ, পুকুরে পুকুরে মাছ। গ্রামের পঞ্চাশ বিঘের পুকুরপাড়ের বাজারটাতে যান, দেখবেন, ৬০/৭০ শতাংশ মাছই দূরের বাজার থেকে আসা। প্রধানত অন্ধ্র থেকে। ওই পুকুরের মাছের চারা অন্ধ্রে যাবে। সেখানকার ১০ ফুট বাই ১০ ফুটের চৌবাচ্চাতেও তা দু-তিন কেজি হয়ে উঠবে। হাজার হাজার মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে আবার ফিরে আসবে ওই বাজারেই। কিন্তু ওই পুকুর থেকে বড় মাছ উঠে আসবে না কুড়ি ফুট দূরত্বের ওই বাজারে। এই বাস্তবতা যে কতখানি বিভীষিকাপূর্ণ আত্মঘাতী নির্বুদ্ধি বা অতিবুদ্ধি প্রসূত, তা বলে শেষ করা যায় না।

এই 'পরিমিত' দারিদ্র যে সহনীয়তার মাত্রা অতিক্রম করে না- সরকার পক্ষের এই ছিল এতাবৎ অভিজ্ঞতা। এর ফলে তাঁরা হয়েছিলেন অন্ধ এবং আয়েশি। তারই রন্ধ্র পথে প্রবেশ করেছে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড়-গোর্খাল্যান্ডের সমস্যা। সমগ্র গ্রামবাংলার এই অভ্যুত্থানকল্প পরিস্থিতি। এই অভ্যুত্থান সঠিক লক্ষ্যে চালিত হয়েছে কিনা, তা বলবার মতো সময় আসেনি এখনও। কিন্তু তাকে রোধ করবার চেষ্টা করা হচ্ছে সরকারের তরফ থেকে। হচ্ছে, মূলত শিল্পায়নের যুক্তি দেখিয়ে। দেখা যাচ্ছে, শিল্পায়নের বিপক্ষে বলছেন না বিরোধীরাও। বলছেন, কোন শিল্প, কোথায়, কেমন করে হবে, এ সম্পর্কিত কিছু কথা। তবু তাঁদের শিল্পবিরোধী দলে ঠেলে দেওয়ার মধ্যে সুবিধে দেখছেন সরকার পক্ষ।

শিল্পায়নের যুক্তি দেখাতে গিয়ে কৃষির তরফের যুক্তিকে খাটো করে দেখানোর একটি প্রয়াস লক্ষ করি। কৃষির বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি, কৃষি লাভজনক নয়। বলা হচ্ছে, শিল্পের জন্য জমি অধিগৃহীত হলে কৃষিতে যে লাভ হত তা যাতে অব্যাহত থাকে, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সময় তা দেখা হবে। এ দুটি কথার প্রথমটি ঠিক নয় এবং দ্বিতীয়টি বুদ্ধির আলস্যে উদ্ভাবিত, অথবা চাষির বুদ্ধিকে আলস্যে আবিল করার লক্ষ্যে উদ্গীরিত। রাসায়নিক কৃষি বলে গত তিন-চার দশক যা চলছে তা বিজ্ঞানসম্মত কৃষি নয়, ব্যয়বহুল কৃষি। ব্যয়বাহুল্য উত্তরোত্তর বর্ধনশীল।

কিন্তু কৃষিবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ওই ব্যয়বহুল কৃষি একটি পরিত্যাজ্য পন্থা। জৈব বা প্রাকৃতিক কৃষি অত্যন্ত লাভজনক, যদি তার উপযোগী সমাজ প্রযুক্তিটি উধাও হয়ে না থাকে। প্রশ্ন করি, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সময় কোন

সময়ের হিসেব ধরা হবে? ব্যয়বহুল তথাকথিত বিজ্ঞানসম্মত কৃষির, না সঠিক উপায়ে সম্পাদিত জৈব কৃষির? পরিত্যাজ্য কৃষির, না বরণীয় কৃষির? কৃষিকে লাভজনক করে তোলবার উপযোগী সমাজপ্রযুক্তির কোনও সমবায়িত সমাজ পরিকল্পনার কথা কি সরকার পক্ষ বলতে পেরেছেন?

প্রতিটি ব্লকে একটি করে জৈবগ্রাম গঠনের প্রস্তাব আছে সপ্তম বাম সরকারের প্রথম বাজেটে। কিন্তু উপযুক্ত সমাজ-প্রযুক্তির অভাবে ওই জৈবকৃষিও হবে কোম্পানিকৃত কৃষি। গোবর সার, কেঁচো সার, পাতাপচা সার কৃষক হাতের কাছে পাবে না। কোম্পানির ঘর থেকে কিনতে বাধ্য হবে। সহযোগিতা ও সম্প্রীতি থাকলে যে কৃষি প্রভূত লাভজনক হতে পারে, কোম্পানির মুনাফার লক্ষ্যে গৃহীত জৈব প্রযুক্তির প্রয়োগে তাই আবার অতি ব্যয়বহুল হয়ে উঠতে পারে, লাভ কমে আসতে পারে। ক্ষতিপূরণের হিসেবের সময় সরকারের সুবিধে হতে পারে।

আগামী দিনের বরণীয় লাভজনক জৈবকৃষির উপযুক্ত সময় প্রযুক্তিটি কেমনতর হতে পারে তা আলাদা আলোচনার বিষয়। কিন্তু এ ব্যাপারে কিছু মাত্র সন্দেহ নেই যে, সরকারের কৃষি সংক্রান্ত দিশাহার নীতিই কৃষিকে করে তুলেছে অলাভজনক। শুধু তাই নয়, কৃষিকেন্দ্রিক সমাজকেও করে তুলেছে বিধ্বস্ত। এই বিধ্বস্ত সমাজই বাংলাকে আজ বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সমাজ ধ্বস্ত হয়েছে সমাজ মধ্যবর্তী মানুষের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের বিনষ্টির পথ ধরে।

সমাজকে যদি সঞ্জীবিত করতে হয়, তাহলে কৃষি ও কৃষিকেন্দ্রিক বিচিত্র শিল্পের পুনরুদ্ধার করতে হবে ওই সম্পর্কের পুনরুদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে, উভয়ের পারস্পরিকতায়। নিকটবর্তী মানুষের পরস্পর সম্পর্কের অবরোধ উন্মোচনের জন্যেই লালগড়ের অবরোধ জন্ম নিয়েছিল। গোর্খাল্যান্ড ও কামতাপুরও পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সম্পর্ক অবরুদ্ধ করতে চাইছে, নষ্ট হয়ে যাওয়া নিকটবর্তী মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের আশ্চর্য সম্ভাবনাকে লক্ষ্যগোচর করতেই। সিপিএম এটা বুঝতে না পারার দ্বারা নিজের আশ্রয় খুঁজছে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়েই।

বিরোধীপক্ষকে সিপিএমের অন্ধতার প্রকৃত বিরোধী হতে গেলে সমাজপ্রযুক্তিগত বিকল্প চেতনার আন্তরিক শরিক হতে হবে। অন্যথায়, বাংলার সাময়িক বিপর্যয় নতুন সৃষ্টির প্রতিশ্রুতিবাহী না হয়ে, চূড়ান্ত ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে সভ্যতাকেই। সেই জন্যেই আমরা কৃষি জমি তথা অববহৃত স্বপ্ন ব্যবহৃত ও অপব্যবহৃত ভূমিখন্ডে এক ধরণের সৃষ্টিশীল সমবায়ের প্রস্তাব দিয়েছি— প্রকৃত পরিবর্তনের লক্ষ্যে। কারণ ক্ষমতা শুধু এক দলের হাত থেকে অন্য দলের হাতে গেলেই পরিবর্তন আপনার গুণে আপনি কলাপের মতো বিকশিত হয়ে আমাদের আচমকা চমৎকৃত করে দেবে না কিছুতেই— নিশ্চিত জানি তা!

মনীষী অম্লান দত্ত ঃ এক দূরতর তারা

ছোটবেলায় শুনেছিলাম, ঋষিরা লোকান্তরিত হলে তারা হয়ে যান। দূর থেকে বিচ্ছুরণ করেন আলো। নিদেনপক্ষে দিশা। মনীষী অম্লান দত্ত তারা হলেন কিনা জানি না, তবে দিশা বিচ্ছুরণ করবার মতো আলো যে তাঁর ভাঁড়ারে অপ্রতুল নয়, বাঙালি যত তাড়াতাড়ি সেটা হৃদয়ঙ্গম করবে, ততোই মঙ্গল।

এতাবৎ বাঙালি যে তা বোঝেনি, সেটা স্পষ্ট তাঁর প্রায় নিঃশব্দ প্রস্থানের মধ্যে। যখন ছিলেন, তখনও ছিলেন নিঃসঙ্গ, প্রায় পরিত্যক্ত। আশার কথা শুধু এই, ভ্রান্ত ও পতিত সময়ে পরিত্যক্ত হওয়া মানেই, অথবা অবক্ষয়ের যুগে উপেক্ষিত হওয়া মানেই, মহাকালে তাঁর কোথাও স্থান হবে না, তা নয়। বরং দেখা যায়, সমকালে সচরাচর তাঁরাই বেশি উপেক্ষিত, ভাবীকাল যাঁদের বরণ করেছে সাগ্রহে।

তুলনাহীন রকমের নির্মোহ হলেও এই মানুষটির বিশেষ একটি মমতা ছিল নিঃসঙ্গতার প্রতি। এর জন্য তৈরি হয়েছিল একটি আপাত কঠিন নির্মোক, যা তাঁর অতি-সংবেদনশীল মনকে দিয়েছিল সুরক্ষা। ভাবনাকে ভাবীকালের কাছে পৌঁছানোর জন্যে তাঁর নৈঃসঙ্গ্য হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত উপকারী। যাঁরা তাঁকে উপেক্ষা করেছেন তাঁরা তাঁকে আহত করতে পারেননি তো বটেই, হয়তো সাহায্যই করেছেন। দুঃখের কথা এই, যাঁরা উপেক্ষা বা অবহেলা করতে পারেন উৎসাহের সঙ্গে, তাঁরা জানেন না যে, ইতিহাসে হারিয়ে যান তাঁরাই।

ভাবীকালের জন্যে কোন্ সঞ্চয় সুরক্ষিত আছে তাঁর ভান্ডারে? অনন্ত ভাবীকালের কথা জানি না। অন্তত এই একুশ শতকের জন্যে? বেশ কিছু বিষয় ছিল তাঁর আলোচনার উল্লেখযোগ্য এলাকা। তিনি অর্থনীতির এক অনন্য অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বচ্ছন্দ পদচারণা ছিল রাজনীতি সমাজনীতি ও মনস্তত্বের প্রসারিত ক্ষেত্রে, গভীরতর তলে। তাঁর প্রধান অনুসন্ধানের বিষয় ছিল, নীতি ও রাজনীতির মধ্যে পুনর্বিষব কেমন করে সম্ভব তার সুলুক্ সন্ধান। তিনি তাঁর আর্ষদৃষ্টিতে লক্ষ করেছেন, প্রান্তবর্তী মানুষের দিশাহারা সন্ত্রাসবাদ ও রাষ্ট্রের সুসংগঠিত সমরাস্ত্রবাদ প্রচলিত রাজনীতিরই অপরিহার্য অঙ্গ। লক্ষ করেছেন, রাষ্ট্রবাদী কেন্দ্রায়িত অর্থনীতির পোষক রাজনীতির দ্বারা ভেঙে পড়ছে পরিবার ও সমাজ। সেই ভাঙনের ফাঁকটা দিয়ে প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা ঘটছে এক দিকে দুর্মর ভোগবাদের, অন্যদিকে গোষ্ঠীগত গোঁড়ামির। এবং এসবেরই প্রভাবে জন্ম নিচ্ছে উদ্ধত মৌলবাদ। এরই ফলে মানুষ বিপন্ন হচ্ছে মনস্তাত্বিকভাবে, ভুগছে শুধু একাকীত্বে নয়, অস্তিত্বগত অর্থহীনতায়।

শুধু কি সমস্যার জটিলতাতেই আবর্তিত হয়েছে তাঁর অনুসন্ধান? একেবারেই নয়। সমস্যার উত্তরে অত্যন্ত জোরালোভাবেই তিনি জানিয়েছেন তাঁর প্রত্যয়ের কথা। তা হল বিকল্প এক সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার কথা। তাঁর মতে, বিকল্প সমাজ-ব্যবস্থার জন্য চাই বিকল্প জীবনদর্শনও।

এই বিকল্প সমাজ তাঁর কাছে আত্মীয় সমাজ। রবীন্দ্রনাথও এই আত্মীয় সমাজের কথা বলেছিলেন। অনেকে মনে করেছেন, এই সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি উন্মুখ হওয়া আসলে এক ধরণের পলায়নপরতা, এক ধরনের সুমধুর স্বপ্নপ্রয়াণ। সমুদ্রের মোহনায় পৌঁছে নদীর আবার উৎসভূমির দিকে ফিরে যাওয়া। যাঁরা এমনটি ভাবেন,

তাঁরা জানেন না যে, তাঁরাও আছেন আরও বড়ো কোনও স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে। তাঁরা স্বপ্ন দেখেন, প্রচলিত বাজার অর্থনীতি এবং তার প্রণোদক ভোগবাদী দর্শন বিশ্বের প্রায় সাতশো কোটি মানুষকেই সুরক্ষিত রাখতে পারবে সুস্থায়ীভাবে। সেই সুরক্ষার জন্যেই নাকি বিশ্বজোড়া সমরাস্ত্রের প্রতিযোগিতা!

মনীষী অম্লান দত্ত সমরাস্ত্র ও ভোগবাদের এই পরস্পর-আশ্রয়ী প্রতিযোগিতা এবং তারই পরিচালনার জন্য উদ্ভাবিত প্রচলিত রাজনীতির হাতে সভ্যতার সুরক্ষা সম্ভব বলে মনে করতেন না। বিগত শতাব্দী বিদ্বেষে আর বিচ্ছেদে বিক্ষত হয়েছে ওই ত্রয়ীর প্রভাবেই। আরও একটা শতাব্দী ওই ত্রয়ীর প্রভাব যদি অব্যাহত থাকে তাহলে সভ্যতার সব স্বপ্ন যে চুরমার হয়ে যাবে, এমনটাই মনে করেন তিনি। অর্থনৈতিক অসাম্য এবং পরিবেশগত সংকট দূরীকরণের কোনও যথার্থ দিশা এই ত্রয়ীর হাতে নেই বলেই বিকল্পের সন্ধানী হয়েছেন তিনি। তাঁর মনে হয়েছে, একুশ শতককে হতেই হবে সম্প্রীতি ও সহযোগিতা-প্রধান। অনেকেই ভোগবাদ ও সমবাস্ত্রবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেও, তার পরিপোষক রাজনীতিটার বিরুদ্ধে কী বলবেন, কেমন করে বলবেন, কিছুই ভেবে পান পা। অম্লানের বানী চির-অপরিম্লান। তিনি বিশ্বাসী ছিলেন বাইরে থেকে এবং উপর থেকে নয়, ভিতর থেকে এবং নিচের থেকে।

বিশ্ব জুড়ে কী করণীয়, তার বিচার একরকম। স্থানীয়ভাবে কী করণীয় তার বিচার আবার আর একরকম। স্থানীয় কর্মকান্ডের পরিচালনায় তিনি সব থেকে অগ্রাধিকার দেন গ্রামের পুনরুত্থানকেই। গ্রামীণ সংস্কৃতির তথা আত্মীয় সমাজ-সংস্কৃতির আধারেই দূর হতে পারে সাম্প্রদায়িকতা তথা যাবতীয় 'আমরা-ওরা'-র পাপ। বেকারত্বের গ্লানিও অনেকাংশে। রজ্জুবদ্ধ হতে পারে লোভের দুর্বারতা। গ্রামকে ভেঙে শহর গড়ার দিশাহীন প্রক্রিয়াই যে জঙ্গলমহল সমস্যার অন্যতম কারণ, এমনটাই ছিল তাঁর মত।

সর্বোপরি হিংসার দর্শনে তথা শ্রেণীসংঘর্ষের দর্শনে ছিল তাঁর প্রবল অসমর্থন। ধনিক শ্রেণীর প্রতি বিদ্বেষ, ধন-ভোগের প্রতি প্রীতি থেকেও যে জন্মাতে পারে, তা আজকের অধিকাংশ বামপন্থীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই স্পষ্ট হবে। অধ্যাপক দত্ত স্বল্পতম উপকরণে জীবনাতিপাত করতেন, নিজের অধিকাংশ কাজ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিজেই করেছেন, অথচ যারা ভোগকেই জীবনের সার বলে জেনেছে তাদের প্রতি তার কোনও হিংসা ছিল না। সাম্যবাদের তত্ত্ব আওড়াতে আওড়াতে হাজার কোটিপতি হয়ে উঠতে যাদের বাধা নেই - তাদের সঙ্গে তাঁর মতের মিল না হওয়াই সম্ভব। তিনি সাম্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। অথচ সাম্যের দিকে এগোনোর সব থেকে সোজা পথটি তাঁরই জানা ছিল সব থেকে ভালো। সেই পথে চলতে হলে মোহহীন, লোভহীন যে জীবনদৃষ্টিটি থাকা দরকার তা তাঁর যথোচিত পরিমাণেই ছিল।

একটি অহিংস ক্ষমাস্নিগ্ধ মন তাঁর মধ্যে সতত জাগ্রত থাকলেও তাঁর স্পষ্টভাষিতা রূঢ়তার ধারে-কাছে পৌঁছে যেত কখনও। সেই জন্যেও তিনি সহজ লোকপ্রিয় ছিলেন না। তিনি বিশেষ কোনও পুরস্কার পাননি। অনেকের কাছেই শুনেছি, ভারতরত্নের নীচে আর কোনও পুরস্কার তাঁকে মানাবে না বলেই পুরস্কারদাতা সংস্থাগুলি দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। শুধু কি তাই? তাঁকে বোঝার ক্ষেত্রে বাধা কি আমাদের মধ্যে নেই? তাঁর সত্য-নিষ্ঠা,

মানবপ্রীতি, মোহহীন জীবন-দর্শন কি চেনা জগতের থেকে অনেকটাই অপরিচিত এবং ওপরের তলার নয়?

তিনি ছিলেন স্বভাববিনয়ী, স্বল্পভাষী। বাংলার সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ বক্তাদের একজন হয়েও তিনি ছিলেন একজন অতি যত্নশীল শ্রোতা। তিনি শিল্পী ছিলেন না, সাহিত্যিক ছিলেন না, ম্যাজিশিয়ান ছিলেন না, মিউজিশিয়ান ছিলেন না। ছিলেন কেবল একজন চিন্তাবিদ। কোন মাপের চিন্তাবিদ ছিলেন তিনি? হাজার বছরের বাঙালির ইতিহাসে সেরা দশজন চিন্তাবিদের একজন ছিলেন কিনা, তার বিচার করতে হলে তাঁকে বিস্তৃতভাবে পড়া চাই, গভীরভাবে বোঝা চাই। রবীন্দ্রনাথ গান্ধী, বার্ট্রান্ড রাসেল ও শ্রীচৈতন্যের দ্বারা আলোকিত পথের পথিক তিনি (শেষোক্ত জনের প্রতি তাঁর যে ছিল বিমুগ্ধ প্রীতি, সে বিষয়ে জানবার বিশেষ সুযোগ ঘটেছিল লেখকের — যখন তিনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন ৫ মার্চ, ২০১০ গিরীশমঞ্চে চৈতন্য সম্পর্কে বলবার জন্যে)। বিগত হাজার বছরে তাঁর স্থান কোথায় হতে পারে সেই বিচারের থেকে আরও বড়ো কথা হলো, এই একুশ শতক জুড়ে যদি তাঁকে আমরা না পাই, তাহলে আমরা বঞ্চিত তো হবই, বিলুপ্ত হব কিনা তা বলতে পারি না। তিনি জীবনে ছিলেন দূর নেপথ্যে, মৃত্যুর তোরণ দ্বার দিয়ে তিনি যদি আমাদের হৃদয় ও বুদ্ধিলোকে প্রবেশের পথ না পান, তাহলে ক্ষতি আমাদেরই। জীবনে যাঁর হারাবার ভয় ছিল না কোনও, মৃত্যুতে তিনি নতুন করে কিছু কি হারাতে পারেন?

তাই বর্তমান শতক জুড়ে তাঁর অনুসরণে চিন্তার অগ্রগতি অব্যাহত রাখতেই হবে আমাদের। তার জন্য বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তার পরীক্ষা ও প্রয়োগে হতে হবে উদ্যোগী। অন্যেরা যদি তাঁকে উপেক্ষা করাই ভালো বলে মনে করেন, তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরই উচিত রেলের তরফ থেকেই এগিয়ে আসা। অন্যান্য মতের সঙ্গে তাঁর বিকল্প ভাবনার প্রয়োগ বা পরীক্ষাক্ষেত্র নির্মাণ করা। সে ক্ষেত্রের সর্বভারতীয় নাম হতে পারে 'অম্লান দত্ত ইনস্টিটিউট ফর সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং' অথবা অন্য কিছু। গ্রাম-বাংলার প্রতিটি স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত দশকজোড়া লক্ষ্য নিয়ে এখনই চালু হওয়া উচিত অম্লান দত্ত প্রবন্ধ বা বির্তক প্রতিযোগিতা। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হওয়া উচিত তাঁর রচনা। বাংলার সমস্ত স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সাধারণ লাইব্রেরিতে স্বযত্নে রাখা উচিত তাঁর গ্রন্থাবলী। সমবেত বাঙালি তাহলে অচিরেই দেখতে পাবে, তাঁর কাছে আলো আছে, প্রভূত আলো। বুদ্ধির আলো, ভালোবাসার আলো।

আশার নাম জলগ্রাম

বঙ্গের বামপন্থীরা ছিলেন শহরের উপজাত। যুক্তফ্রন্ট দ্রুত বিলুপ্ত হয়েছিল শহরেই তাঁদের প্রতিপত্তি সীমাবদ্ধ ছিল বলে। যুক্তফ্রন্টের পতনের পরেই গ্রামের দিকে তাঁদের বিশেষ নজর পড়েছিল। ১৯৭৭ সালে তাঁরা ক্ষমতায় এসেছিলেন গ্রাম-সম্পর্কিত তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা আকর্ষণ সৃষ্টি করে নয় অবশ্য। জনতা দলের ঘাড়ে চেপে। তারপর প্রায় ৩৩ বছর টিকে থেকে বিশ্বরেকর্ড করা সম্ভব হয়েছিল, গ্রামেরই নিরঙ্কুশ সমর্থনে যদিও।

কিন্তু সে সমর্থনে কি যুক্ত হয়েছিল গ্রামের অন্তর? শ্বাসরোধী ভয় গ্রামকে বোবা করে দিয়েছিল বলেই কি ভাষাতে প্রকাশ পায়নি গ্রামের উচ্চারিত অসমর্থন? সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম সেই ভয় ভাঙিয়ে দিয়েছে বলেই কি আজ মুখর হয়েছে গ্রাম, গ্রামেরই পক্ষে জেগেছে শহর? বলা বাহুল্য, এইসব প্রশ্নের উত্তরে সকলে একমত হবেন না। কেউ কেউ বলতে পারেন, ওই সব কথা বিদূষণমূলক। কিন্তু যে সরকারি বামপন্থীরা বাংলাকে তিন দশকেরও বেশি তাঁদের অধীন করে রাখলেন, তাঁরা কি বোধ্য ভাষায় বলতে পারবেন তাঁদের গ্রামনীতি কী ছিল, ভূমিনীতি কী ছিল? তা গরিবের পক্ষে ছিল, সাধারণ মানুষের পক্ষে ছিল, অথবা কোম্পানিকুলের পক্ষে ছিল? অথবা ছিল নিছক বিদেশ থেকে নকল করা কোনো নষ্ট রাজনীতিরই পোষনে?

আপাতভাবে এমনটাই দেখিয়েছিল যে, যাদের জমি নেই এবং আছে - উভয়ের মধ্যে শুরু-হওয়া শ্রেণীসংঘর্ষের ফলস্বরূপ দেশে শুভসাম্য প্রতিষ্ঠিত হল বলে। কিন্তু দেখা গেল, বাম-সরকারের গৃহীত ভূমিবন্টন ও বর্গানীতি ছিল নঞর্থকতা-তাড়িত। এই নীতিগুলি কার কার বিরুদ্ধে কেমন করে চালিত হবে, সেটাই শুধু ঠিক হয়েছিল সযত্নে, কিন্তু কার কার পক্ষে কেমন করে উপকারে লাগবে তা, সে সম্পর্কিত সম্ভাব্য সব পরিকল্পনা থেকে গেছে উপেক্ষিত। সেই জন্যে দরিদ্র চাষি সামান্য ভূমি লাভ করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ধরে রাখতে পারেনি অথবা ধরে রাখতে পারেনি প্রত্যাশিত উৎপাদনের বৈচিত্র কিংবা মাত্রা।

দরিদ্র চাষিদের সমবায়িত উদ্যোগের সম্ভাবনাময় সুযোগ থেকে করা হয়েছে বঞ্চিত। সব মিলিয়ে ভূমির মালিক, ভূমিহীন চাষি - কারও পক্ষেই আর আকার্ষণীয় থাকনি গ্রাম। সেই জন্যই বামফ্রন্টের আমলে গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী পরিযান দেশ-বিভাগ-জনিত পরিযানকেও গেছে ছাড়িয়ে। ভূমি-মালিকেরা জমি বেচে দিয়ে চলে যাচ্ছেন শহরে।

দিন মজুরেরাও অনেকে। বিচিত্র কৃষি ও কৃষি-সংক্রান্ত শিল্পের অভাবে। অনেকে আবার গ্রামে থেকেই দৈনিক কাজ খুঁজতে যান গ্রামান্তর বা নিকটবর্তী শহরে। গ্রামে কাজ পাওয়া যায় না। কেমন করে পাওয়া যাবে, শহুরে সংস্কৃতির উপজাত বামফ্রন্টীয়দের কাছে তার খবর নেই বলেই তাঁরা ঊর্ধ্ববাহু হয়ে আবাহন জানিয়েছেন করপোরেটদের। যে-সমস্ত ফ্রন্টীয় গ্রামেই সমুৎপন্ন হয়েছেন, প্রকৃত দিশা বা দীক্ষার অভাবে তাঁরা শহুরেদেরই অনুকরণ করেছেন বানরবৎ।

শহর ও গ্রাম পরস্পর পরিপূরক যে হয়ে ওঠেনি, আগ্রাসী শহর হয়ে উঠেছে গ্রামের হত্যাকারী— এই সত্যটা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন বঙ্গীয় বামফ্রন্টীয়েরা। প্রধানত উনিশ ও বিশশতকী বামপন্থার ছাঁচের প্রভাবে। অন্য শাসন ক্ষমতায় পৌঁছানোর এবং তাতে অধিষ্ঠানের রেকর্ড গড়বার জন্যে সন্ত্রাসের নরম গরম ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা তৈরী হয়েছে দিশা ও দীক্ষাহীনতার শূন্যতার মধ্যেই। এই শূন্যতাই গ্রামকে করেছে নিঃস্ব, রিক্ত, হতশ্রী। স্কুল, কলেজ ক্লাব, লাইব্রেরি, হাসপাতাল - সবেরই পার্টি অফিসে পরিণত হওয়া ওই শূন্যতাকেই ঢাকবার মূঢ় অপচেষ্টা প্রসূত।

বামফ্রন্টীয় বিশারদেরা যখন দেখলেন তাঁদের গৃহীত কৃষিসমাজ পরিচালনার আদর্শ পার্টির অভূতপূর্ব শ্রীবৃদ্ধি ঘটালেও হতশ্রী করেছে গ্রামকে, তখন, ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের প্রথম দর্শকের মধ্যেই নিজেদের ঘোষিত পথের বিপরীতে হাঁটাই প্রশস্ত মনে করলেন। কিন্তু জনগণকে সেটা খোলসা করে বললেন না। বলা সম্ভব ছিল না। কারণ, এতদিন যে তাঁরা চলেছিলেন কানাগলিরই পথে, সেটা তাহলে স্বীকার করে নিতে হয়। যে শ্রেণীসংঘর্ষের তত্ত্বের সুবিধামতো বাজনা বাজিয়ে বোবা করা হয়েছিল বাঙালিকে, তার থেকে সরে আসতে হয়।

সুতরাং কতকটা গোপনেই তাঁরা ঝুঁকলেন দেশি ও বিদেশি বহুজাতিক সংস্থাদের সঙ্গে আঁতাতের দিকে। ১৯৯০ সালের কাছাকাছি সময়েই এ সব শুরু। এরই টানে হাওড়া, হুগলি ও মেদিনীপুরের বিস্তৃত অঞ্চল অতিথিদের উপঢৌকন হিসাবে নির্ধারিত হল। মধ্যবিত্ত বা কম-গরিবের কাছ থেকে জমি খুব-গরিবের গা ঘেঁসে নব্বুইয়ের দিনগুলিতেই তা বেরিয়ে যেতে চাইল খুব ধনীদের দিকে। এই বাস্তবতাকে প্রকাশ্যে স্বীকার করা মানে ভূমিবন্টন ও বর্গাসংক্রান্ত সব কৃতিত্বকে মাটি হতে দেওয়া। সুতরাং গোপনীয়তার আশ্রয়ই শ্রেয়।

সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের অন্তত দেড় দশক আগে গ্রাম ধ্বংস করে শহর গড়ার এক মহা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল সরকার ডানকুনির উপকণ্ঠে। লক্ষ্য ছিল, মন্ত্রী-আমলার সঙ্গে মহা-ধনী মাল্টিন্যাশনালদের শ্রেণী সমন্বয়। এই সমন্বয় কাতরতার বাজার চলতি বড় মুখ করা নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি অনেক দিন। পাওয়া গেল সম্ভবত ২০০২ সালে, অমর্ত্য সেন যখন লিখলেন What is Globalism নামের প্রবন্ধ। সেখানে ওই কাতরতার একটি শুভনাম দেওয়া হয়েছিল Historical Reality বা ঐতিহাসিক বাস্তবতা। এই ধুয়াটা পাবার পরেই বড়-মুখ করে আলোচনা শুরু হয়।

শুরু হয় কিন্তু আলোচনা অগ্রসর হতে পারেনি একটুও। অর্থনীতি বিজ্ঞানের কথা আলাদা। অমর্ত্য সেনের যুক্তি বিন্যাসের প্রকৃতিও স্বতন্ত্র। তা স্বতন্ত্র আলোচনাই দাবি করে। কিন্তু সমাজ রাজনীতির এলাকায়, তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে, দেখা গেল বিকট বৈপরীত্য। ওপরে সমন্বয়ের শুভনাম হল 'ঐতিহাসিক বাস্তবতা' কিন্তু নিচে সে বাস্তবতা বিস্তৃত হল না। সেখানে থেকে গেল অন্যরকম বাস্তবতা। দু'বিঘের বৃদ্ধার সঙ্গেও দিনমজুরের লড়াই-লড়াই-লড়াইয়ের বাস্তবতা। ওপরে সমন্বয়, নীচে সংঘাত। ওপরে 'ঐতিহাসিক বাস্তবতা', নীচে স্তব্ধ

হয়ে থাকল প্রাগৈতিহাসিক বাস্তবতা। একই দেশে একই কালে দুই রকমের ব্যবস্থা কায়েম করতে চাইলেন যাঁরা, তাঁরা দরকার মনে করলেন না তার যুক্তিসূত্রটা দাঁড় করাতে। অথচ নীচের স্তরে সংঘাত এবং ওপরের স্তরে সমন্বয়ের দ্বারাই অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল ম্যাকিনজে প্রভৃতি কোম্পানির দ্বারা কৃষি ব্যবস্থাকেও ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা। সবকিছুর সঙ্গে কৃষি ব্যবস্থাকেও কোম্পানিকুলের হাতে সমর্পণ করার আয়োজন শুরু হয়েছিল, কৃষিমন্ত্রী কমল গুহের অনড়তায় প্রত্যাহৃত হয়েছিল সে চেষ্টা। কিন্তু কৃষি সমাজ নিজে নিজেই কীভাবে সংগঠিত হতে পারে, সে দিকে চিন্তা তো অগ্রসর হয়নি পরন্তু সেই সমাজে বিভেদের বাস্তবতারই সুযোগ নিয়ে কৃষি জমিকে কোম্পানিকূলের হাতে তুলে দেবার চেষ্টা হয়ে ওঠে প্রবলতর। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম এই প্রক্রিয়ারই অপেক্ষাকৃত প্রকট রূপ। শহর গ্রামে সর্বত্র ছোট-বড় প্রমোটারের হাতে প্রায় নিঃশব্দেই চলেছিল সমর্পণ এবং তার সঙ্গে মানানসই সন্ত্রাসের প্রক্রিয়া। ডানকুনিতেও চলেছিল তা। হিংস্রতা যেখানে আশ্রয় খুঁজেছিল অধিকতর গোপনীয়তার, প্রলম্বিত পরিকল্পনার।

ডানকুনির উপনগরীর ইতিকথা

'৯০ সালের কাছাকাছিই সরকারের মাথায় আসে কৃষি ও জলা জমির অন্যরকম ব্যবহারের পরিকল্পনা। তাঁদের তৈরি 'স্যোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ তাঁদেরই অনাস্থার কারণে কতকটা চিনের অনুকরণে, তাঁরা ঝোঁকেন করপোরেট ইঞ্জিনিয়ারিং এর দিকে। হাইরোডের কোল ইন্ডিয়া ব্রিজের কাছে বিস্তৃত ভূখন্ড মনে মনে সালেমের নামে উৎসর্গ করে সাধারণ চাষির ওপর জমির বেচা কেনায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রাজ্য সরকার। কারণ, সরকার তা কিনে নেবে। চাষিরা সরকারকে জমি দিতে না চাওয়ায় সরকার কৌশলী বুদ্ধির আশ্রয় নেয়। জায়গাটির নিকাশি ব্যবস্থাটিকে ক্রমশ অবরুদ্ধ করে তোলা হয়। জলে ডুবিয়ে রেখে জমিগুলিকে চাষের অযোগ্য করে তোলার পর জায়গাটি যাতে মাছ চাষেরও অযোগ্য হয়ে পড়ে তারজন্য জলকেও দূষিত করার প্রক্রিয়াটি সূচিত হয়। ফলে সাধারণ চাষির পক্ষে ক্রমশ অসম্ভব হয়ে পড়ে ওই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ জায়গার ব্যবহার। অবরুদ্ধ এলাকার আয়তনও গত বিশ বছরে উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। অসহায় চাষি সিঙ্গুরে জমি দেবার বহু আগেই ক্রমশ চাষ ছেড়ে 'স্বেচ্ছায়' পেশান্তরে চলে যায়। হয়ে যায় দিন মজুর, ফেরিওয়ালা অথবা ভিখারি।

জায়গাটিতে জলের অবরোধ সৃষ্টিতে খুব যে বেগ পেতে হয়েছে তা নয়। এক/দেড়শো বছর আগেই শুরু হয়েছিল সে প্রক্রিয়া। প্রথমে হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইন ও পরে কর্ড লাইন তৈরী হওয়ায়। তারও পরে দিল্লি রোড ও দুর্গাপুর হাইওয়ে নির্মাণের ফলে দুটি রেল লাইন তৈরী হওয়ার ফলে যে জলাবরোধ তৈরী হয়েছিল তা অপসারণের জন্য ব্রিটিশ আমলেই কাটা হয়েছিল ডানকুনি খাল, যা বৈদ্যবাটী থেকে বালি পর্যন্ত বিস্তৃত। ডানকুনি উপনগরীর জন্য সালেমকে উপঢৌকনের জমি যাতে চাষিরা সদলবলে স্বেচ্ছায় দান করে। তারজন্য ওই খালটিকে সাজিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি সরকার। জনগণের ওপর উৎপাতও চলতে থাকে। উৎপাতের

মধ্যে অন্যতম দূষিত জলকে শোধন করার সব চেষ্টা বানচাল করে দেওয়া।

সকলেই জানেন, কলকারখানার বর্জ্য যদি দূষণ সৃষ্টি করে, তাহলে সে দূষণ থেকে মুক্তির নানা পথ আছে। কিন্তু ডানকুনি উপনগরীর সংলগ্ন এলাকায় কোন্ রহস্যে যে সব পথ অবলম্বিত হল না দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে? যেখানে সব মিলিয়ে প্রায় দশ লক্ষ লোক বিপন্ন হয়ে পড়েছেন এবং এরই মধ্যে আট থেকে দশ হাজার একর জমি অবরুদ্ধ হয়ে অনুর্বর হয়ে পড়েছে, যা সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রামের থেকেও অনেক বড় ক্রিমিনাল অফেন্সের জায়গা হয়েছে, অনেক নিঃশব্দে?

ওই অঞ্চলটির পাঁচ/ছ'টি পঞ্চায়েত জুড়ে সাকুল্যে কুড়িটি মৌজা পূর্ণত অথবা আংশিকভাবে কিনে নেবার ইচ্ছা প্রথম প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন গত নয় লোকসভা ভোটের আগে, নগরোন্নয়ন মন্ত্রী বাবু অশোক ভট্টাচার্য, ঝাকারি মৌজায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন, 'এ জমি লইব কিনে' বলে তার আগে প্রায় আঠারো বছর জুড়ে নিঃশব্দে চলেছিল নৃশংস সব আয়োজন। পিয়ারাপুর, বড়া, রাজধরপুর, কানাইপুর, মনোহরপুর, পহলানপুর ও ডানকুনি পৌরসভার একাংশের শত সহস্র উপেনরা প্রায় দু-দশক ধরে ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিলেন।

অধিগ্রহণ বা আগ্রাসনের এই প্রলম্বিত পদ্ধতিটি নির্বাচিত হয়েছিল যে যুগে, তখন বহুজাতিকদের প্রতি বিস্ফারিত-চোখ লোলুপতা অন্ধ করেনি সিপিএমকে। বামপন্থা সম্পর্কে মুখে না হলেও, মানসিক হাতাশাও সিপিএম-এর কাছে এতখানি সর্বাত্মক হয়ে ওঠেনি আজকের মতো। এই হতাশার তাড়না এবং লোভের আকর্ষণই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্বে সিপিএমকে মাত্রাছাড়া ভাবে করপোটের সংস্কৃতির পক্ষে অভিযানে প্ররোচিত করেছে, সন্দেহ নেই। যদিও মনে হয়, নতুন পদ্ধতির ঘটনার ভুতই যে প্রকৃতপক্ষে ঘাড় মটকেছে সিপিএমের, সে খবর কি সবাই রাখেন? আমরা জানি, সিঙ্গুরই পথ দেখিয়েছে নন্দীগ্রামকে। কিন্তু কেউ কি জানি, সিঙ্গুরকে পথ দেখিয়েছিল কে?

সিঙ্গুর থেকে মাত্র দশ/বারো কিমি উত্তর-পূর্বে নয়া দ্বিতীয় উপনগরীর জন্য চাপা কিন্তু নিশ্চিতভাবে হিংসাপূর্ণ উদ্যোগ ওই অঞ্চলের মানুষের মনে পুঞ্জিত করে তুলেছিল একই সঙ্গে তিক্ততম ক্ষোভ ও তীব্রতম ভয়। ধীর পদ্ধতি সম্পর্কে বিরক্ত সরকার সিঙ্গুরের ক্ষেত্রে যখন সহসা বীরত্বপূর্ণ অভিযানকেই শ্রেয় বলে মনে করল, তখনই মানুষের ভয়ও সহসা অতিক্রম করে গেল সহনীয় মাত্রার চূড়ান্ত সীমা। তখন সিঙ্গুরেই ফেটে পড়ল ক্ষোভ। সারা বাংলায় ছড়ানো ছোট বড়ো ক্ষোভগুলি জমাট বেঁধে উঠল। তার পরে সে হল ইতিহাসের অঙ্গ। বাঙালির একুশশতকী নবজাগরণের প্রথম অধ্যায় কি না তা ভাবী কালই বলবে।

ইতিহাসের শিক্ষা

ইতিহাসের শিক্ষাটা কী? এ নবজাগরণ কোন পথে সিদ্ধি চাইছে? তিনটে স্পষ্ট পথ হতে পারে। হতে পারে কয়েকটি উপপথও। পথগুলি হতে পারে কোম্পানির পথ, সরকারি পথ এবং সামাজিক পথ। সরকারি পথে পদে পদে ব্যর্থতা আসছে বলে কোম্পানির পথটাই নির্বিকল্প মনে করেছে সরকার। সর্বশক্তি দিয়ে নিযুক্ত হয়েছে তার সেবায়। সমাজবাদী হয়েও সমাজের পথটিকে সর্বাংশে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত কোন যুক্তিক্রমে গৃহীত হল? বিশ্বব্যাপী সমাজবাদের মহাপতনে তাঁরা কি এতটাই হতাশ এবং দিশাহারা? যে সরকারি বামপন্থীরা বিতর্কে অতি আগুয়ান ছিলেন, তাঁরা এখন অপরাধে উন্মুখ হলেও সাত চড়ে রা কাড়েন না - এ বড়ো দুর্গতি।

সত্য বটে, সামাজিক সমবায়ের পথও পুনঃপুন ব্যর্থতায় লাঞ্ছিত। কিন্তু রাশিয়া বা ভারতেও সমবায় আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে বলেই ধরে নিতে হবে সব ক্ষেত্রেই তা ব্যর্থ হবে? নতুন নতুন পরীক্ষার কোনও চেষ্টা করা হবে না আর? রাশিয়া ও ভারতের সমবায় তো রাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় যান্ত্রিক সমবায়। প্রকৃত সামাজিক বা সমাজ-ব্যক্তিগত সমবায়ের নব নব রূপ আবিষ্কৃত হতে পারে না কি, যেখানে উৎখাতের গল্প থাকবে না কিন্তু সকলেই পেতে পারে ন্যূনতম সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি? যেখানে ব্যবস্থাপনাটি হতে পারে যথাসাধ্য সৃষ্টিশীল এবং মুক্তবন্ধ? যেখানে সাম্যের জন্য মূঢ় বাক্যবিলাস না থাকলেও সমন্বয়ের জন্য থাকবে সৌম, প্রচেষ্টা, আন্তরিক আয়োজন? যেখানে গ্রামের মধ্যেই এবং শহরে-গ্রামেও উগ্র আগ্রাসিতার পরিবর্তে ঘটতে পারে সহযোগিতা ও সম্পর্কের সৌন্দর্যরূপের প্রতিষ্ঠা, তার নব নব উদঘাটন?

এ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, নগরীর সম্প্রসারণ প্রকল্পে সরকার শুধু নিজের নাকই কাটেনি, গ্রামবাসীদের যাত্রাভঙ্গও করেছে। এখন করণীয় কী? সারা বাংলা জুড়ে করণীয় আর বিশটি মৌজার উপদ্রুত ক্ষেত্রের জন্য করণীয় স্বতন্ত্র হতে বাধ্য। সমগ্র বাংলার ক্ষেত্রে প্রথম বলবার কথা এই যে, গত কয়েক দশক ধরে গ্রাম ভেঙে শহর গড়ার যে দিশাহারা উন্মদনা চলেছে, তাকে প্রশমিত করা। দুই, গ্রামের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও শিল্পের পুনরুত্থান ঘটিয়ে একুশ শতকীয় গ্রামীণ আবাসন কেমন হওয়া উচিত সযত্নে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূত্রপাত করা, তার জন্য স্বল্প মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য নির্ধারণ করা। এই কাজগুলি যতটা যথোচিতভাবে সম্পন্ন করা যাবে, ততটাই কমে যাবে নগর সম্প্রসারণের মার-কাট প্রয়োজন। এর ফলে বিশ্ব সমস্যার দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিকেরও সুরাহার সূচনা হওয়াই সম্ভব। এক, পরিবেশ দুষণজনিত সমস্যা, দুই, অসাম্যজনিত সমস্য।

বিশটি মৌজার ক্ষেত্রে করণীয় সম্বন্ধে ভাবতে হলে দেখতে হবে সমস্যাটি আসলে কী। সমস্যাটি এখানে এই নয় যে, জলাবরুদ্ধ ওই বিশাল ক্ষেত্রের মানুষজনেরা জমি কার হাতে তুলে দেবেন তা নিয়ে মহা চিন্তায় পড়েছেন। তাঁদের চিন্তা চাষাবাদ করে তাঁরা নিজেরাই যাতে নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে পারেন, তার উপায় খোঁজা। সরকারি দল তাঁদের ইচ্ছার সম্মাননায় যদি অক্ষম হয়, বিরোধী পক্ষেরই উচিত

নতুন দিশা নিয়ে তাঁদের কাছে হাজির হওয়া। সেখানে অতি-দলীয়তা বা যেকোনও গোষ্ঠীবাদিতার বাধা আছে, তা অপসারিত করা। ওই জায়গা থেকেই বাঙালির নবজাগরণের নান্দীপাঠ শুরু করা।

জলগ্রাম আবাসন

এই রচনার উদ্দেশ্য যেমন সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আড়ালে পড়ে-যাওয়া সমধিক পৈশাচিক এক সমস্যার আবরণ উন্মোচন করা, তেমনি তার সমাধানের ব্যাপারেও যৌথ চিন্তার পটভূমি রচনা করা। সন্দেহ নেই, বিবিধ বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সক্রিয় অংশগ্রহণেই সার্থক হতে পারে সে যৌথ চিন্তা।

কখনও কখনও জল বিপদ ঠিকই, কিন্তু তাকে সম্পদে পরিণত করাও সম্ভব। ডানকুনি সংলগ্ন উপনগরীর পরিকল্পনা ওই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ যে গ্রহণ করেননি, কথাটা বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা ছিল না। তাঁরা কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন, সরেজমিনে তদন্ত করে তার যে আভাস পাওয়া গেল সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।

তাঁরা জমির ব্যক্তিগত মালিকানা ছাড়তে রাজি নন- এ যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি, শুধু ব্যক্তিগতভাবে ওখানে ভদ্র কিছু করাও অসম্ভব। তাহলে কি গত পনেরো-বিশ বছরের মতো আগামি দিনগুলিতেও বাঙালির জাতীয় মূঢ়তার স্মারক হয়েই পড়ে থাকবে প্রায় আট/দশ হাজার একর জমি? শুধু পড়ে থাকা নয়, প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মানবিক দূষণের নারকীয় উৎস হয়ে থাকবে কেবল?

এ পর্যন্ত আমাদের অভিজ্ঞতা এই, সরকার ফেল করে এবং কোম্পানি (এ ক্ষেত্রে মাল্টিন্যাশনাল) ফেল করেছে। সমাজেরও ট্র্যাক রেকর্ড একেবারেই ভালো নয়, ভালো থাকবার কথাও নয়। কারণ এটা সরকারিকরণ ও কোম্পানিকরণের যুগ। সমাজ ও পরিবারের শক্তিকে হরণের দ্বারাই এই দুইয়ের শক্তিবৃদ্ধি। সরকার, কোম্পানিকূল এবং সমাজের ধারাবাহিক অকৃতকার্যতার পরিপ্রেক্ষিতে কোনও রাজপথ না হলেও উপপথেৰ কথা কি ভাবা যায় না আজ? নিরন্তর পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে গ্রহণ-বর্জনের পথে ক্রমশ স্পষ্ট করে তোলা যায় না কি সে উপপথ? যা পরিচিত ত্রিবিধ পথের শক্তিকে আংশিকভাবে ব্যবহার করেও, কোনও বিশেষ পথের হুবহু অনুকরণ হবে না? যা একই সঙ্গে হবে সোসিও ইনডিভিজুয়াল বা ব্যক্তি-সামাজিক? যা শুধু প্রকৃতির সুস্থায়ী সম্পদেরই চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার করবে না, উদঘাটন করবে ব্যক্তির আত্মসম্পদের এবং সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে প্রতিভাত সৌন্দর্য সম্পদের অনন্ত সম্ভাবনা?

এই সম্পদগুলির সদ্ব্যবহারের জন্য আমরা বেশ কিছুদিন ধরে নয়া তেভাগা আন্দোলনের কথা বলছি। পুরোনো তেভাগা বা বর্গা আন্দোলন বিশেষ বিশেষ দলের সঙ্গে গরিব মানুষের সম্পর্ক সাময়িক ভাবে ভালো করলেও, দেখা যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত শেষ বিচারে, তা, সমগ্র গ্রামবাংলাকেই কোম্পানির হাতে তুলে দেবার যুক্তিকেই বৈধ করে তুলতে চেয়েছিল - যা গরিবের পক্ষেই হয়েছিল সব থেকে বেশি বিপদ। নয়া তেভাগা আন্দোলন মাটি ও মানুষের মধ্যে নিবিড়তর সম্পর্কের লক্ষ্যেই পরিকল্পিত। ন্যূনতম সামাজিকতার ছত্রছায়ে

ব্যক্তিগত আয়ের পথকে প্রশস্ততর করতেই উদ্ভাবিত। মালিক, মঞ্চ (রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে যার নাম হতে পারে আত্মীয় সমাজমঞ্চ বা স্বয়ম্ভর সবুজ সমাজ-মঞ্চ) এবং মজদুর - এই তিনের মধ্যে বিধৃত হবে সমগ্র সমাজ, যেখানে সকলের সুষম সুরক্ষা না ঘটলেও সকলের ন্যূনতম প্রত্যাশার সর্বোত্তম সম্পূরণ সম্ভব। সমাজ-প্রযুক্তিগত এই সব বিষয়ের খুঁটিনাটি আলাদা অবকাশে, হয়তো বারবারই আলোচনার যোগ্য, উদ্ভাবনার বিষয়।

আপাতত কথা নয়, ছবি আঁকি - জলগ্রাম-আবাসনের। হাত অপটু হলেও। আট/দশ হাজার একর জোড়া জলা বা অর্ধজলা জমিকে প্রথমেই জলাবরোধ মুক্ত করতে হবে। জল যথেষ্ট সরে গেলেও তবু থেকে যাবে যে নিচু এলাকা, তার কুড়ি থেকে পঁচিশ শতাংশ ক্ষেত্রকে গভীরতর জলাধারে পরিণত করতে হবে। করতে হবে সকলের প্রসন্ন সহমতের ভিত্তিতে, সহ-অংশীদারিত্বে। এ কাজ হই হই করে হবে না। ধৈর্য চাই, শক্তি চাই। ভীতির নয়, প্রীতির। সড়োগড়ো করে নিতে হবে, ভুলে যদি গিয়ে থাকি সে শক্তির বর্ণপরিচয়। আত্মস্থ করে নিতে হবে, অতি-দলীয়তার অভিশাপ অপসারণের আয়াস।

জলাধারগুলি এমনভাবে বানাতে হবে, যার পাড়ে পাড়ে ধারে ধারে ক্রমিক উচ্চতায় জেগে উঠবে প্রথমে ধান, তারই পরে সব্জি এবং মাঝে মাঝে বাগান। বাড়ি বানাবার জমি যেখানে হবে জলগ্রাম আবাসন। যার বিচিত্র সৌন্দর্য-রূপ আলাদা অবকাশেই আঁকার যোগ্য। যা ক্রমে বিস্তৃত হয়ে যাবে বালি থেকে বৈদ্যবাটী - প্রায় পঞ্চাশ বর্গ কিলোমিটার। যে আবাসনের তরুণ কবি হয়তো কুমুদরঞ্জনের অনুসরণে সত্যিই লিখবেন ঃ

বাড়ি আমার শ্যামল-সুনীল জলগ্রামের বাঁকে
জল যেখানে সোহাগভরে স্থলকে ঘিরে রাখে।

জলপথ ও স্থলপথ উভয়ই হবে এই গ্রাম বা গ্রামগুলির চলাচলের উপায়। ইতিমধ্যে কাটা সরু ও চওড়া খালগুলিতে যার এক ধরণের সূচনা হয়েই গেছে। মহানগরীর অতি-নিকটেই ভেড়ি ও জলপথগুলিতে সাঁতার ও নৌপ্রতিযোগিতার সুযোগ পাওয়া যাবে। শহর ও গ্রামের অন্য রকম উৎসব ক্ষেত্রেও পরিণত হবে। গ্রামে-মিলিত হবে শহর গ্রামেরও শর্তে। এখানে মানুষে মানুষে, মানুষে প্রকৃতিতে সখ্যের সূত্রে পরীক্ষিত হবে এতাবৎ আবিষ্কৃত দুই ধরনের সমাজ প্রযুক্তির সমন্বয়ের সম্ভাবনা। বৈষয়িক ও আত্মীয় সমাজ প্রযুক্তির। বিক্রয়ের সঙ্গে বিনিময়েরও স্বীকৃতি বা সুযোগ থাকবে এখানে। আংশিকভাবে হলেও। গরিবের আরও প্রান্তবর্তী বা পরিত্যক্ত হওয়া প্রতিরোধ করা যাচ্ছে কতখানি তারও চলবে পরীক্ষা। স্থানীয় গ্রামীণ উপাদান ও উপকরণের অগ্রাধিকার থাকবে এই আবাসন প্রকল্পে। সম্ভাব্য সবরকমের মিশ্র চাষ ও মিশ্র শিল্পের অবরোধ অপসারণেরও আয়োজন থাকবে এখানে। শহরের প্রকৃতি-অনুরাগী মানুষদেরও অংশগ্রহণের জৈব গ্রামের থাকবে উপায়। সরকারি একশো দিনের ও অন্যান্য কর্মসূচীর প্রয়োগ হবে। প্রচলিত মূঢ় যান্ত্রিকতায় নয়, সৃষ্টিশীলভাবে, যা হবে স্বাভাবিক সম্প্রসারণক্ষম এবং সহজ প্রতিফলনযোগ্য। যার বিচিত্র খুঁটিনাটি স্পষ্টীকৃত হতে পারে রাজ্যজোড়া যৌথ-চিন্তার আয়োজনে।

এর জন্য লড়াই-লড়াই-লড়াই এর আপজাত্যপূর্ণ অজাচারী উদভ্রান্তি নয়, ভালোবাসার বাণী চাই। যার জন্যে বাংলার বুদ্ধিজীবীদের আরও একবার পথে নামা চাই। প্রথমেই উন্মুক্ত করা চাই জলাবরোধের শৃঙ্খল। বিরোধীদের তরফে প্রথম মাটিটা কাটুন মমতা। সেই মাটিটা দূরে ফেলে দিন স্বয়ং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। শাঁখ বাজিয়ে কর্মকান্ডের সূচনা করুন মহাশ্বেতা দেবী। অনভ্যাসের অসুবিধায় ইস্টবেঙ্গলের রেফারির হুইসেলটাও ধার নিতে পারেন। মেধা, মীরতুন-শাঁওলী-অপর্ণারা যোগ দিন। শঙ্খ-সুনীল-সৌমিত্র, গণমুক্তি পরিষদ - বুদ্ধিজীবী মঞ্চ-স্বজন। সকলে দিন হুলুধ্বনি। একুশশতকী নবজাগরণের জন্যে শঙ্খ ঘন্টা-বাদ্যে মুখরিত হোক সমগ্র বাংলা। আকাশ থেকে আশীর্বাদ করুন সদ্য প্রয়াত মনীষী অন্নাল।

২০১১ সালের আগে অর্থাৎ বিরোধী আসনে বসার আগে, সেটা কি একেবারেই অসম্ভব, বুদ্ধবাবু? কোনও প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ নয়, সকাতর প্রার্থনা, আপনিও কি যোগ দিতে পারেন না আপনারই বিরুদ্ধে, 'রক্তকরবী'-র রাজার মতো? জানি, ব্যক্তিগতভাবে আপনি অসাধু নন — আপনার মন্ত্রিসভা সম্পর্কে আপনার মত যা-ই হোক। জানি, আপনি যা কিছু করেছেন, দলীয় আদর্শের জন্যেই করেছেন। সে-আদর্শ ভুল হোক বা ঠিক। এও জানি, পৃথিবীতে নৃশংসতম নিষ্ঠুরতার আয়োজন চলেছে আদর্শেরই আকর্ষণে। আলেকজান্ডার থেকে হিটলার কিংবা স্তালিন, রুশ থেকে লাদেন - এঁরা কেউই আদর্শহীন নন। আপনি এবার ভালোবাসার পাশে এসে দাঁড়ান। আপনি ব্যবসায়ী সমাজের খপ্পরের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। চলে আসুন আমাদের আত্মীয়-সমাজের চৌহদ্দির মধ্যে, যোগ দিন দুই সমাজের সমন্বয়ের মধ্যে যে সম্ভাবনা আছে তার উদঘাটনে। সত্যি বলছি, কলকাতার জন্য অতিরিক্ত মাছের জোগান এখানকার আত্মীয় সমাজই দিতে পারবে - আপনাকে গলদঘর্ম ও দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটতে হবে না অন্ধ্র কিংবা তামিলনাড়ুতে। সব মিলিয়ে এর ফলে শুধু দশ লক্ষ মানুষের ওপর করা সীমাহীন অবিচারের প্রতিকারের সূচনা হবে না, ত্রমমুক্তিরও সূচনা হবে - মা-মাটি-মানুষের, তথা রাহুগ্রস্ত এ অভাগা বাংলার! যা হয়তো একদিন হয়ে উঠবে একুশশতকী বামপন্থারই দাবি!

রাজনৈতিক পরিবর্তন জরুরি হলেও পর্যাপ্ত নয়, প্রয়োজন নবজাগরণ

মাত্র কয়েকটি দিনের ব্যবধানে দু'রকমের ঘটনা ঘটল, যা বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। একদিকে মুখ্যমন্ত্রী-সহ সিপিএমের বরিষ্ঠ নেতা শ্যামল চক্রবর্তী-বিমান বসুদের নেতৃত্বে, অন্যদিকে মমতা-সহ বিরোধী দলনেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় দু'রকমের উদ্যোগ লক্ষগোচর হল। বাংলা থেকে সিপিএমের ক্ষমতাচ্যুতি যখন আসন্ন হয়েছে তখন মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধী পক্ষের প্রতি শাপ-শাপান্ত শুধু দুর্বলের আস্ফালন বলে চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচেছ, এর দ্বারা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি তাঁর প্রবল অনাস্থাও প্রকাশ পাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের মডেল যাঁরা মানবেন না, তাঁরা চুরমার হয়ে যাবেন - একথা বলার মধ্যে প্রকাশ পায় নিছকই এক অরুচিকর অসহিষ্ণুতা। এই অসহিষ্ণুতাই সম্প্রসারিত হয়েছে পরম মাননীয় গোপালকৃষ্ণ গান্ধির প্রতিও। মাত্রা তার এতটাই বেশি যে, রাজ্যপালের পদটিই তাঁরা তুলে দেওয়ার পক্ষে।

এই মাত্রাছাড়া অসহিষ্ণুতা কোনও রাজনৈতিক দলের অভ্যুদয়কালের আচরণ হতে পারে না। এসব বিনাশকালেরই লক্ষণাক্রান্ত। এইখানে সিপিএমেরও ভেবে দেখবার মতো একটা বিষয় আছে বলে মনে করি। অন্যান্য দলের সঙ্গে সিপিএমের একটা পার্থক্যের জায়গা তৈরী হয়েছে বলেই একথা বলা। সব দলেরই সাধারণ লক্ষণ জেতা এবং হারা। এদেশে সিপিএমই একমাত্র দল যার পরাজয়ের অভিজ্ঞতাটা বিরল। ফলে গণতন্ত্রে পরাজয়কে কেমন করে দেখতে হয়, সে সময়ের আচরণ কী - সে সম্বন্ধে সিপিএমের অবস্থা কতকটা অনাড়ির মতো। জনগণ যে তাঁদের ত্যাগ করেছে, এ সত্যটা তাঁরা মেনে নিতে পারছেন না। এমনকী, ত্যাগ বা না করার অধিকারটা যে জনগণের থাকা উচিত - এটাও যেন মেনে নিতে পারছেন না তাঁরা। ফলে অন্য রকমের দুই বিপরীত ভাগ্যের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সিপিএমের সামনে - হয় জেতা, নয় বিলুপ্ত হওয়া। অর্থাৎ পার্টিটাই মুছে যাওয়া। সবপার্টির নেতাদেরই বোধহয় ভেবে দেখা উচিত, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জয়-পরাজয়টা ভালো, না তার বাইরে গিয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয় অথবা বিলুপ্তির অপশনটা ভালো। এতদিনের লাগাতার বিজয়ের জাড্য সিপিএমের চিন্তাশক্তিকেও কি পঙ্গু করে দেবে তাহলে? তা যদি হয়, তাহলে সেটা শুধু সিপিএমের দুর্দিন নয়, দেশেরও দুর্দিন। বিরোধী পক্ষকে বিলুপ্ত করে দিয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ের বিশ্ব রেকর্ড করতে গিয়ে সিপিএম যদি সৎ ও সুস্থ বিরোধীপক্ষের ভাষা ও আচার বিস্মৃত হয়, তাহলে সেটাকে দুঃখ বা বিপজ্জনক বলাটাই যথেষ্ট নয়। সৎ ও সুস্থ বিরোধিতার ভাষা আজ সিপিএমকে শিখতেই হবে দেশেরই স্বার্থে। অন্যথায় নীচের কর্মী সমর্থকদের অন্ধভাবে প্ররোচনা দেওয়া ছাড়া সিপিএমের করবার কিছু থাকবে না, যেটা একেবারে কাম্য নয়।

অপরদিকে লক্ষ করবার বিষয় হল, বিরোধী দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক কিছু উক্তি। যেখানে তাঁর বিনয় ও সদাচাররের ওপরেই জোর দিয়েছেন। যাঁরা লোকসভায় জিতেছেন এবং বিধানসভায় জিততে চলেছেন তাঁদের পক্ষে এ আচারণ খুবই প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। সন্দেহ নেই, নেতৃত্বের

এই নির্দেশনা কর্মীদের নিশ্চয়ই কিছুটা সংযত করবে, শোভন করবে। তার ফলে পট পরিবর্তনের পর্বটা অনেকটা শান্তিপূর্ণ হবে।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, নেতৃত্বের শুভ নির্দেশনাই যথেষ্ট নয়। যত অনাচার বা উপদ্রবেরই কারণ হোক, সিপিএমও এধরণের সদাচারের ঘোষণা কখনও কখনও করেছে। কখনও কখনও তা কিছুটা কার্যকারীও হয়েছে। সিপিএমের থেকে প্রকৃত আলাদা হতে গেলে পৃথক আদর্শ চাই, উন্নত দিশা চাই। সে সব নিয়ে বিচার বিতর্কের সূচনা হওয়া চাই। সিপিএম সদাচারের কথা বললেও বাঙালিকে বোবা করে দিয়েছে। সম্প্রতি বাঙালির মুখে কথা ফুটলেও সে কথাকে যথার্থ দিকে এগিয়ে দেওয়া চাই - পৃথক আদর্শ ও উন্নত দিশার অনুসন্ধানে বিচার ও বিতর্কের মুখ আবার খুলে দেওয়া চাই। মনে রাখতেই হবে, সিপিএম-বিরোধী বিপুল জনগোষ্ঠীর কাছে জ্বলন্ত, দৃষ্টান্ত সিপিএমই। এদের অনেকেই সিপিএম-বিরোধী, সিপিএম অন্যায় করছে বলে নয়, সেই 'অন্যায়'টি করার অধিকার তারাও পাবে না কেন, সেই দুঃখেও! সেই জন্যে জ্বলন্ত দৃষ্টান্তরূপে চোখের সামনে আজন্ম যাদের দেখেছে পরিবর্তনের পরে তাদের অনুকরণের প্রলোভন ত্যাগ করা সহজ হবে না। শত্রুভাবে ভজনা করার একটা কথা আমাদের দেশে চালু আছে। কংস কৃষ্ণকে শত্রুভাবে ভজনা করেছিলেন। কৃত্তিবাসের রারণও। সেক্ষেত্রে ভজনাই বড়। চৈতন্যদেব যখন 'হরিভক্তিপরায়ণ চন্ডাল'কেও 'দ্বিজশ্রেষ্ঠ' বলেছেন, তখন অবশ্যই জোর দিয়েছেন, চন্ডালত্বের ওপর নয় - মানুষের নিহিত দ্বিজত্বেরই ওপর। গত বত্রিশ বছরের অষ্টাদশ শতকী আপজাত্য চর্চার সূত্রে ওপরে-নীচে সর্বত্র 'চন্ডালত্ব'-চর্চাকেই গৌরবান্বিত করার চেষ্টা হয়েছে। এই সামূহিক আপজাত্য থেকে বাঙালিকে উদ্ধার করতে হলে শুভ নির্দেশনা ছাড়াও আরও কিছুর প্রয়োজন। দরকার রাজনৈতিক কার্যক্রম ছাড়াও গঠনমূলক কর্মসূচী। যেখানে আমরা-ওরা বাদ দিয়ে সকলেরই কিছু করবার থাকে এবং সম্পদ সৃষ্টির - বিশেষত প্রাকৃতিক সম্পদ সৃষ্টির তথা সুরক্ষার যে অসীম সম্ভাবনা, তারও দ্বার খুলে যায়।

সন্দেহ নেই, সে কাজ অত্যন্ত জুরুরি হলেও তা, অধুনা আমাদের অভ্যাসের অতীত। তাকে আবার অভ্যাসের মধ্যে আনতে হলে অন্য ধরনের পরিবর্তনের কথাও এবার ভাবতে হবে। তাকে পরিতত্রানও বলতে পার! শুধু রাজনৈতিক, পরিবর্তন সেই জন্য জরুরি হলেও যথেষ্ট নয়। পরিত্রানের জন্য চাই জীবন-অভ্যাস ও জীবন-বিশ্বাসগত সমূহ পরিবর্তন। এই বড় ও ব্যাপক পরিবর্তনকে ধারণ করবার জন্য চাই নবজাগরণ। একাধারে প্রাকৃতিক সঙ্কট, কৃষি সঙ্কট ও জীবিকা সঙ্কটের মোকাবিলায় চাই সহযোগিতা ও সম্প্রীতির অন্যতম মানববন্ধন। যা এক মিনিটের নাট্যভঙ্গির থেকে ঘাতসহ এবং শক্তিশালী। সম্ভাবনা যার আদিগন্ত ছড়ানো।

সেই নব মানববন্ধন কেমন করে সাধিত হবে - এ নিয়ে প্রস্তাব আসুক এবং বিতর্ক চলতে থাকুক। উনিশশতকী মহাজনদের সঙ্গে নিয়ে একুশ শতকী নবজাগরণের পথে তারই বাতাবরণে আমরা অগ্রসর হতে থাকি। শুধু পরিবর্তনই নয়, সঙ্কটকে সৌভাগ্যে পরিণত করতে সেই নবজাগরণই আমাদের নির্বিকল্প পথ। যে

শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, কেবল পরিবর্তন তাকে পূরণ করতে পদে পদে ব্যর্থ হবে - এই অলস আশঙ্কা আজ আমাদের কোনও কাজে লাগবে না। কোন পথে আমরা নতুনভাবে জেগে উঠে সার্থক হব, তারই জন্য চলুক আমাদের 'সকল চিত্তকায়া'-র অচঞ্চল চেষ্টা। অতন্দ্র সাধনা।

মা-মাটি-মানুষ ও নয়া তেভাগা

এই সময়ে এই বাংলায় অবিসংবাদিতভাবে জনগণমন অধিনায়িকা রূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জনপ্রিয়তার ওঠা-পড়া আছে। সময়ের দ্বারা সৃষ্ট হলেও সময়োত্তীর্ণ হবার লক্ষণ মমতার স্বভাবে স্পষ্ট। তাঁর সততা, সরলতা, সাহস এবং সহানুভূতি বাঙালির ইতিহাসে তাঁকে অবিস্মরণীয় করে তোলবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু সীমাহীন নৈরাজ্যের পরে অধঃপতিত বিধ্বস্ত বাংলা যে তীব্র আকুলতায় প্রত্যাশা করতে থাকবে তাঁর কাছে, সে সব যথাসাধ্য পূরণ করবার জন্য চাই গুরতর মনোযোগ তথা অন্যতম অনুধ্যান।

এ সব মনোযোগের অনেকটাই যে ইতিপূর্বে মমতার মধ্যে দেখা যায়নি তা নয়। 'বদলা নয়, বদল চাই' বা 'দলতন্ত্র নয় গণতন্ত্র চাই' - এ সব কথার মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞারই প্রকাশ। মুখে মুখে এবং দেওয়ালে দেওয়ালে ফেরা বদলা নাকচের বাণী বাংলার নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে প্রভূত সাহায্য করছে সন্দেহ নেই। সন্দেহ নেই, দলতন্ত্রের ঊর্ধ্বে ওঠার যে কথা মমতা বলেছেন, সে কথা রক্ষায় তিনি যথাসাধ্য সচেষ্ট হবেন। দলের মধ্যে বা প্রশাসনে প্রয়োজনীয় সংশোধন-সংযোজনে তিনি যে যথেষ্ট উদ্যোগী হবেন, তাও নিশ্চিত। এই সমস্ত উদ্যোগ যা সংসদীয় ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত, তা উক্ত ব্যবস্থার ত্রুটি দূরীকরণ তথা বিকৃতি বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। এ বিষয়ে নানা পরামর্শ চোখে পড়ছে নানান জনের লেখায়। সুতরাং অন্য জরুরী কথাই এখানে উপস্থিত করব কেবল।

দলতন্ত্র নয়, গণতন্ত্র চাই

এই পোড়া বাংলায় দলতন্ত্রের যে বিভিষিকা সাম্প্রতিককালে দেখা গেছে তার থেকে বহু দূর পর্যন্ত উদ্ধার সম্ভব হবে সংসদীয় ব্যবস্থার সংশোধনের পথে, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। কিন্তু সংসদীয় ব্যবস্থারও যে একটা সীমাবদ্ধতা আছে এবং তার থেকে উত্তরণ শুধু সংশোধন-সংযোজনের পথে সম্ভব নয়, স্বাধীনতার ছ দশক পরে একথাটা বুঝতে অথবা স্বীকার করতে বাধা থাকবারও কথা নয়।

সংসদীয় ব্যবস্থার হাত ধরে গণতন্ত্রের বর্তমান প্রচলিত রূপটি ফুটে উঠেছে বলে সংসদীয় ব্যবস্থার সঙ্গে গণতন্ত্রের সম্পর্কটিকে অবিচ্ছেদ্য কল্পনা করা হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সংসদীয় রূপটি যে সর্বশ্রেষ্ঠ সে সম্বন্ধে হয়ত তর্ক নেই। কিন্তু রাষ্ট্রিক রূপ ছাড়াও গণতন্ত্রের একটি পারিবারিক এবং সামাজিক রূপও আছে সে কথা বিস্মৃত হওয়া ঠিক নয়। বস্তুত, পরিবারই গণতন্ত্রের আদি লালনভূমি। এমন নয় যে সে-লালন ভূমিতে গণতন্ত্রের কোনও ব্যত্যয় বা বিকৃতি ঘটেনি। যুক্তির খাতিরে একথা মেনে নিতেই হবে যে, একনায়কতন্ত্রেরও লালন-ভূমি এই পরিবারই। পরিবারের প্রধানের প্রতি অতি-বাধ্যতা একনায়কতন্ত্রেরই পোষকতাপ্রসু। কিন্তু এ কথাও মানতে হবে যে, অন্যের গণতান্ত্রিক অধিকারকে স্বীকার করতে হলে অন্যের প্রতি

প্রীতির অধিকারের যে আবশ্যকতা লাগে, পরিবারের বন্ধনীতেই তা লাভ করা সব থেকে প্রশস্তভাবে যায়। সেই জন্যে গণতন্ত্রকে যদি যথার্থভাবে খুঁজতে হয়, তবে তাকে খুঁজতে হবে- রাষ্ট্র সমাজ-পরিবারের পরিব্যাপ্ত ক্ষেত্রেই। সে কথায় আসবার আগে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের গণতন্ত্রকে আরও একটু অনুধাবন করা লাগবে।

দলকে রক্ষা করেও দলের ঊর্ধ্বে ওঠার ব্যাপারটিকে অনেকে মনে করতে পারেন সোনার পাথরবাটির মতোই অবাস্তব। বহুদলীয়, দ্বিদলীয় ব্যবস্থার পাশাপাশি একদলীয়, এমনকী, নির্দলীয় ব্যবস্থার গণকল্যাণের কথাও হয়ত ভাবা হয়েছে তাই। বহুদলীয় এবং দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় মোটের ওপর সফল গণতন্ত্রের দৃষ্টান্ত দুনিয়ায় দুর্লভ নয়। একদলীয় ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের কথা বলা না হলেও গণকল্যাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কম্যুনিস্ট দুনিয়ায়। কিন্তু সে-ব্যবস্থাপনার মহাপতন এবং তৎসহ নৃশংস নিষ্পেষণের যে বিভীষিকা জুড়ে আছে তার ইতিহাসে, তার পরে একদলীয়তার পথে পরীক্ষাযোগ্য আর কিছু আছে বলে মনে হয় না। নির্দল গণতন্ত্রের চেষ্টা শেষ পর্যন্ত এক প্রহসনেই পরিণত হয়েছে সংসদীয় দলবাদী ব্যবস্থায়। নির্দলীয়তা দলীয়তায় পৌঁছানোর বিকল্প এক সোপান হয়ে উঠেছে বলেই নয় শুধু, নির্দলীয়তা আজ পর্যন্ত খুঁজেই পায়নি নিজস্ব কোনও পরিচয়। ঘৃণা এবং না-এর দ্বারা চালিত হয়ে কম্যুনিস্টরা সারা বিশ্বেই নিজেদেরকে আজ অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন। ঘৃণা না হলেও নির্দলবাদীরা নিজেদের হাস্যকর করে তুলেছেন শুধু 'না'-এর দ্বারা চালিত হয়ে। পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়ায় জাত হয়ে সাম্যবাদ যেমন পুঁজিবাদেরই কোলে আত্মহারা হয়ে গেল, দলবাদের প্রতিক্রিয়ায় জাত হয়ে নির্দলবাদীদের অবস্থাও হয়েছে কতকটা সেইরকম। 'তোহে জনসি পুন তোহে সমায়ত সাগর লহরী সমান'। দলতন্ত্রের প্রকৃত বিপরীত আসলে সমাজতন্ত্র। অবশ্য রাষ্ট্রবাদী কম্যুনিস্টরা শব্দটাকে বেদখল করায় শব্দটি তার অর্থ-গৌরব হারিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে শব্দ ধার নিয়ে আমরা তাকে বলতে পারি আত্মীয়সমাজতন্ত্র। দলতন্ত্রের আদি উৎসে আছে হয়ত সভ্যতাপূর্ব অদিম গোষ্ঠীবাদ। কিন্তু আধুনিক দল 'সুসভ্য' 'বৈশ্য' সমাজের সৃষ্টি। বৈশ্য সভ্যতার শক্তি ও সীমাবদ্ধতা উভয়ই আছে তার মধ্যে। দলের শক্তি বিপুল। ফলে ছোট ছোট কাজে সে অপটু। জাহাজ ডিঙি নৌকার কাজ করতে পারে না। আবার ডিঙি নৌকাও জাহাজের কাজ করে উঠতে পারে না। রাষ্ট্রদলের মাধ্যমে যা করতে পারে তার সঙ্গে যুক্ত হওয়া চাই সমাজ ব্যক্তির মাধ্যমে যা করতে পারে সেই শক্তির। টানা এবং পোড়েনের মত এই দুই শক্তি। যদি একই সঙ্গে সক্রিয় হয়, পরস্পর আশ্লিষ্ট হয়ে যদি কাজ করে, তাহলে খুব বড়ো একটা ফল পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। তাতে করে উন্নয়নের উজ্জ্বল শাহরিক মুখের পাশাপাশি দেখা দেবে গ্রামীণ মেদুর মানবিক মুখও।

সমাজের দুই রূপ ঃ

সমাজ শব্দটি উচ্চারিত হলেই সংগঠিত দলের বাইরের প্রসারিত আয়তনটির যে ছবি আমাদের চোখে সচারাচর ফুটে ওঠে, তার মধ্যে কোনও দ্বৈততা দেখা যায় না। একটু অন্যমনস্কভাবে ওই আয়তনটিকে এক

এবং অভিন্ন বলেই আমরা ধরে নিয়েছি। আসলে সমাজের আছে স্পষ্ট দুটি রূপ। বার বার করে বলবার যে, রবীন্দ্রনাথ এই দুই প্রকৃতির সমাজকে বিলক্ষণরূপেই চিনতেন। একটির নাম দিয়েছিলেন বৈশ্য সমাজ, অন্যটির - আত্মীয় সমাজ। এই দুই সমাজের নিশ্চয়ই কিছু কিছু মিল আছে। অমিলও আছে বিস্তর। আপাতত, খুব সংক্ষেপে, অমিলের দিকটা একটু তুলে ধরি।

দুই সমাজের কেন্দ্র একেবারেই পৃথক। আত্মীয় সমাজের কেন্দ্র পরিবার এবং বৈশ্য বা ব্যবসায়িক সমাজের কেন্দ্র নগর। কেন্দ্রগত পার্থক্যের এই মেরু-ব্যবধান দুই সমাজের প্রকৃতিতেও ঘটিয়েছে বিলক্ষণ বিশিষ্টতা। বাজার আশ্রয়ী বৈশ্য সমাজ রাষ্ট্রীয় সংহতির পথ বেয়েই ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে গেছে আজকের বিশ্বায়নে। আর আত্মীয়তা-আশ্রয়ী সভ্যতা পরিবারের সম্প্রসারণের পথেই সংহতি পেয়েছে গ্রাম-সমাজে। অন্যভাবে মুক্তি খুঁজছে বিশ্বাত্মবোধে - 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' -এ। বৈশ্য সমাজ, যেখানে ব্যবসায়িক সম্পর্কই প্রধান, তার প্রাণ ভ্রমরা রক্ষা পায় প্রধানত ন্যায়নীতির শক্তিতে। আত্মীয়-সমাজের প্রাণ-ভ্রমরা সুরক্ষিত থাকে প্রধানত প্রীতির শক্তিতে। প্রথমটির প্রধান আশ্রয় যুক্তি। দ্বিতীয়টির ভক্তি। প্রথমটির মান্য আচার রাজনীতি, দ্বিতীয়টির - ধর্ম। প্রথমটিতে জীবন-লাবণ্যের উৎসে থাকে সম্ভোগ, দ্বিতীয়টিতে - সন্তোষ। প্রথমটি বেশি খোঁজে সুখ, দ্বিতীয়টি - আনন্দ। প্রথমটির প্রধান সম্পদ অর্থ, দ্বিতীয়টির - সম্পর্ক। প্রথমটির সম্পদ সরবরাহের প্রধান মাধ্যম ক্রয়-বিক্রয়, দ্বিতীয়টির বিনিময়। প্রথমটি অগ্রসর হয় রহস্যের নিরসনে, দ্বিতীয়টি-তারই আকর্ষণে। প্রথটিতে মানুষ প্রধানত শক্তিসম্পন্ন হয় বস্তুর ওপর কর্তৃত্বের জোরে, দ্বিতীয়টিতে - আত্মকর্তৃত্বের বলে। প্রথমটি গুরুত্ব দেয় মৃত্যুকে ঠেকানোয়, দ্বিতীয়টি আকৃষ্ট হয়, আমাদের প্রপিতামহদের ভাষায় - অমৃতের সন্ধানে। প্রথমটি ব্যক্তিক মৃত্যুকে বিলম্বিত করলেও উদ্যত আজ সভ্যতার মহামৃত্যুকে ত্বরান্বিত করতে। দ্বিতীয়টি ব্যক্তির মৃত্যুতে পদে পদে পীড়িত হয়েও সভ্যতার প্রবাহকে রেখেছে অব্যাহত। প্রথমটি সফলতা খোঁজে নির্মাণে দ্বিতীয়টি সৃষ্টিতে। প্রথমটির চারণভূমি ব্যক্তি-গোষ্ঠী দল-রাষ্ট্র, দ্বিতীয়টির-প্রকৃতি পরিবার সমাজ (আত্মীয়)। প্রথমটিতে, মানুষকে চাকরি দেওয়া হয়। দ্বিতীয়টিতে সে হয় স্বনিযুক্ত। প্রথমটিতে- উন্নয়নে প্রাধান্য পায় প্রতিযোগিতা, দ্বিতীয়টিতে সহযোগিতা।

দুই সমাজের দ্বৈততা বিষয়ে এক্ষুনি যা সূত্রাকারে বলা হল, তার মধ্যে বেশ কিছু অংশে অস্পষ্টতা রয়ে গেল নিশ্চয়ই। কিন্তু এখানে সব কথার খুঁটিনাটি ব্যাখ্যাতে যাব না। আপাতত পাঠকের ধীশক্তির ওপর ছেড়ে দেব। সেগুলি বর্তমান প্রসঙ্গে তেমন জোরালোভাবে জরুরি নয়। শুধু সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা - এই দুটি শব্দে আরও কিছু সময় অতিপাত করব। আবহমান আত্মীয় সমাজে প্রতিযোগিতা জিনিসটা অপরিচিত না থাকলেও, আমরা-ওরার নানা স্তরের মধ্যে যত ক্ষীণাকারেই হোক, আত্মীয়তার একটি ধারা প্রবহমান ছিল। আত্মীয়-সম্পর্কের সৌন্দর্যরূপ সম্পদের সৃষ্টিতে ও বন্টনে মোটের ওপর একটা ভূমিকা নিয়েছিল, স্থিতাবস্থা বজায় রেখেছিল সুদীর্ঘকাল। এই দুদীর্ঘকালীন স্থিতাবস্থা সভ্যতায় এনেছিল একটা জড়তা, এক পায়ে চলার মতো পরিস্থিতি।

পুঁজিবাদের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার সূত্রে প্রতিযোগিতা নামক বৃত্তিটার শক্তিপ্রদর্শন শুরু হল হয়তো ঐ জড়তাই অভিঘাতে। অচিরেই তা কোণ-ঠাসা করে দিল সহযোগিতার শক্তিকে। সম্পদের সৃষ্টি ও বন্টনে প্রতিযোগিতার শক্তি প্রাধান্য পাওয়ায় অপেক্ষাকৃত সম্পদবান ও শক্তিমানদের হাতেই সম্পদের পুঞ্জীভবন ঘটল। এরই ফলে ১৮২০ সালে যেখানে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ছিল ৩ঃ১ হারে, ২০০০ সালে বাড়তে বাড়তে তা হল ১০০ঃ১। প্রতিযোগিতার মন্থনদন্ডে মন্থিতদধি মাখনের মতোই সম্পদ অধিকতর মাত্রায় ভেসে উঠল সমাজের উপরিতলেই। প্রান্তবর্তী মানুষ হল আরও বেশি প্রান্তবর্তী। সারা পৃথিবী জুড়েই সভ্যতায় ঘটল বৈষম্যের বৃদ্ধি। আমাদের রাজ্যে ঘটল তীব্রতর হয়ে। সভ্যতা বঞ্চিত হল দুই পায়ে চলার সুবিধা থেকে। শুধু উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল বা দক্ষিণ-পশ্চিমের জঙ্গলমহলেই নয়, সাধারণ সব গ্রামেই বাজার-সর্বস্বতার প্রতি ঝোঁক সমাজে এবং প্রকৃতিতে ঘটলো গুরুতর গোলযোগ।

অথচ দুই প্রকৃতির সমাজের তথা সভ্যতার সংযোগ ও সামঞ্জস্যেই ঘটতে পারে অপেক্ষাকৃত সুস্থায়ী রকমের সমৃদ্ধি এবং দুঃখমোচন। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে গভীর কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন - বিশেষত স্বদেশী সমাজ, কালান্তর, পল্লী প্রকৃতি প্রভৃতি গ্রন্থে। বলেছিলেন বৈশ্য সামাজিকতার আগ্রাসিতার বিরুদ্ধে এবং এই আগ্রাসিতার বিরুদ্ধে আগ্রাসী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধেও। এইখানে 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটি বিশেষভাবে স্মরণ করতে বলি। 'রাশিয়ার চিঠি'-ও। কারণ মহাত্মা গান্ধি এবং কার্ল মার্কস উভয়েই বৈশ্য সমাজবাদ বা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ছিলেন অনেক বেশি আপোসহীন। গান্ধিজির প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেননি তাঁর সে-অপোসহীনতা। আবার, রাশিয়া-দর্শনকে তীর্থদর্শনের সঙ্গে তুলনা করেও বামপন্থার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা জবরদস্তি ও যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছিলেন তিনি। বামপন্থার যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে পৃথিবীতে। কিন্তু দক্ষিণপন্থার প্রধান গুণ গণতন্ত্রকে না হলেও তার সব দোষই প্রায় আত্মস্থ করেছে সে পরীক্ষা। অন্ধ বিরুদ্ধতা বোধ হয় অন্ধ ও বধির— দুই-ই। আত্মসমর্পণকেই ডেকে আনে তা। সাম্যবাদী পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইতিহাস তাই হয়ে ওঠেছে পুঁজিবাদের কাছে অন্ধ আত্মসমর্পণেরই অন্য নাম।

অপর দিকে, গান্ধিচিন্তার পরীক্ষা বা প্রয়োগ আজও পর্যন্ত হয়নি পৃথিবীতে কোথাও। ভারতবর্ষ খ্যাত হয়ে থাকবে বোধ হয় একই সঙ্গে তাঁর জন্ম ও সমাধিভূমি রূপে চিহ্নিত হয়ে। তাঁর চিন্তার প্রয়োগ কবে কোথায় হতে পারে জানি না। পরিবেশ এবং অসাম্যজনিত সমস্যা বিপজ্জনকতার শেষমাত্রা অতিক্রম করার আগে তো নয়ই, পরেও হবে কি না জানি না। হয়ত সভ্যতার সার্বিক ধ্বংস সাধনের পরেই কোনও সময় প্রাসঙ্গিক বলে প্রতীয়মান হতেও পারে তাঁর চিন্তা।

সামঞ্জস্যই রবীন্দ্র-চিন্তার সব থেকে শক্তিমান দিক। যাঁরা কোনও একটা ঝোঁকের দ্বারা চালিত হন, রবীন্দ্রচিন্তার সুসমঞ্জস সর্বগ্রাহিতায় তাঁরা কিঞ্চিৎ দিশাহারা বোধ করেন। বৈশ্য সমাজ ও আত্মীয় সমাজ - এই

দুই-এর মধ্যে সামঞ্জস্য হয় কী করে, সেটা ছিল রবীন্দ্রনাথের অন্যতম জীবন-ভাবনা এবং জীবন-সাধনাও। কোনও তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের মনে আগে দেখা দিত না। তিনি পরিষ্কার জানতেন, জুতোর মাপে পা নয়, পায়ের মাপেই জুতো বানানো চাই। অর্থাৎ তাঁর মনে ছিল, তত্ত্বকে অনুসরণ করে জীবন নয়, জীবনকে অনুসরণ করেই তত্ত্ব। এই জন্যে কোনও মনগড়া তত্ত্বের প্রয়োগ করতে তিনি উদ্যত হননি শিলাইদহ কিংবা শ্রীনিকেতনে। শ্রীনিকেতনের কাজে যোগ দেবার আগে তিনি এলমহার্স্টকে বলেছিলেন এইটা আবিষ্কার করতে যে কেন মানুষ দুঃখী, কেন মানুষ দরিদ্র। তাঁর মনে হয়েছিল, গ্রাম-সমাজের পুনর্গঠনে সহযোগিতার শক্তিকে ডানা মেলতে দিতে হবে। তার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনের জন্যই সমবায় আন্দোলনের পক্ষপাতী হয়েছিলেন তিনি। বৈশ্যসামাজিক রাষ্ট্রতন্ত্রের পাশাপাশি আত্মীয় সামাজিক 'সমাজ-রাজতন্ত্রে'র প্রবক্তা হয়েছিলেন তিনি।

কেউ কেউ মনে করতে পারেন, রবীন্দ্রনাথের ভাবনা এবং চেষ্টা ছিল নিতান্ত অন্তবর্তীকালীন। পরাধীনতার রুদ্ধতার মধ্যে হীনবল এক কম্পিত পদক্ষেপ। সাময়িক এক কবিজনোচিত বিনোদন। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কে চলে আসা এই ধরনের ধারণার নিষ্পত্তি হওয়া চাই আজ। এই ধারণার দ্বারা চালিত হয়েই মানব সভ্যতার সর্বদেশের সর্বকালের এই অন্যতম সেরা সন্তানটির গভীরতম কথা ও কাজগুলি তাঁর স্বদেশ এবং স্বভাষীদের কাছেও উপেক্ষিত থেকে গেল। তাঁর কথাগুলি আজ যদি সামগ্রিকভাবে বিচার করা হয় এবং সংক্ষেপে উপস্থাপিত করা হয় তাহলে বলতে হবে যে, দুই ধরণের সমাজ শক্তির যোগকেই তিনি সত্য পথ বলেছেন। শুধু বণিক সভ্যতার সম্পদ দিয়ে যেমন সব মানুষের সুরক্ষা সম্ভব নয়, শুধু আত্মীয়-সমাজ-শক্তির দ্বারাও নয়। তাঁর মতে, প্রথমটি 'পৃথিবীকে যেখানেই স্পর্শ করেছে সেইখানেই বিরোধ পীড়া এবং অপমান জাগিয়েছে, সেইখানেই বিশ্বপ্রকৃতির শ্রী নষ্ট করে দিয়েছে'(সত্যের আহ্বান)। বিশ্বায়নের যুগে বণিক-বৃত্তি তার লোভের লোল-জিহ্বা যখন প্রসারিত করেছে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে, মহা বিশ্বব্রহ্মান্ডের একপ্রান্তে টিম্‌টিম্‌ করা, এখনও পর্যন্ত-আবিষ্কৃত একমাত্র প্রাণের আশ্রয়, এই 'কালো মাটির বাসা'টিকে পৌঁছে দিচ্ছে প্রায় চূড়ান্ত ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে, তখন, এই মহা-মানুষটির পদপ্রান্তে বসে, তাঁরই দ্বারা দীক্ষিত হয়ে, আত্মীয়-সমাজ-সংস্কৃতির স্নিগ্ধ আতপত্রটিকে শহুরে উজ্জ্বল অংশের বাইরে পড়ে থাকা অসংখ্য অসহায়-গ্রামীণ মানুষের সুরক্ষায় প্রয়োজনমতো প্রসারিতভাবে উন্মীলিত করে দিতেই হবে আজ।

কেমন করে দিতে হবে? না যাতে করে 'প্রত্যেক মানুষ বহু মানুষের শক্তির ফল লাভ করে' (সমবায়)। আর একটু বিস্তারিত বললে, 'যথেষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতাকে সর্বসাধারণের সম্পদ করে তোলবার মূল উপায় হচ্ছে ধন-অর্জনে সর্বসাধারণের শক্তিকে সম্মিলিত করা। ... সমবায় প্রণালীতে অনেকে আপন শক্তিকে যখন ধনে পরিণত করতে শিখবে তখনই সর্বমানবের স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপিত হবে (সমবায়)'। সন্দেহ নেই, কর্পোরেট-প্রণালীতে সফলতার যুগে রাষ্ট্রীয় বা সমবায়-প্রণালীতে সম্পদ সৃষ্টি খুব বড়ো রকমের প্রতিপ্রশ্নের মুখোমুখি

আজ। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির সঙ্গে সঙ্গে সমবায় সংস্থাগুলিও অলাভজনক হয়ে উঠেছে। প্রয়োজন দেখা দিয়েছে নতুন রাস্তা খোঁজার। প্রতিস্পর্ধায় নয়, পাশাপাশি চলবার জন্যে।

নয়া তেভাগা আন্দোলন

মমতা মা-মাটি-মানুষের কথা বলেছেন মাত্র সিঙ্গুর আন্দোলনের কাল থেকে। কিন্তু নিজের সত্তায়-শিরায়-স্নায়ুতে তৃণসুলভ মাটি-মাখা একটা গন্ধের ধারা আগে থেকেই প্রবাহিত না থাকলে, নাগরিক মমতার পক্ষে এত সহজে সাড়া দেওয়া সম্ভব ছিল না মা-মাটি-মানুষের ডাকে। সম্ভব হত না গ্রামীণ পবিত্র সরলতাকে অন্তরে-বাইরে এমন সহজ সাবলীলতায় আত্মস্থ করা। আসলে মমতার মামার বাড়ি বীরভূমের প্রত্যন্ত গ্রামে। সেখানে তাঁর প্রায় বছরে একবার অন্তত যাতায়াত ছিল ছেলেবেলায়। নমিতা দিদির কথা মনে আছে যেমন মমতার, মনে হয় তাঁর স্মৃতিতে জ্বল জ্বল করছে তেমনি নিষ্পেষিত, রুদ্ধকণ্ঠ গ্রামবাংলার ছবি। পুরুষ-সমাজের আগ্রাসী অধিকারবোধ তাঁর নমিতা দিদির জীবন থেকে সব আশা কেড়ে নিয়েছিল, নগরসমাজ (যা বৈশ্য সমাজের প্রাণকেন্দ্র) তেমনি আগ্রাসিতায় ভূসম্পদ তথা গ্রাম-সম্পদের সার্বিক বিত্তহরণ করে চলেছে, তা কি মমতার সংবেদনের বাইরে থাকতে পারে? শিল্প ও কৃষিকে তিনি বলেছেন, 'হাসি খুশি দুই বোন'। গ্রাম ও শহরও তাই নয় কি? গ্রামের খুশি কি গত তিন/চার দশক ধরে হাতমুচড়ে কেড়ে নেওয়া হয়নি? কেন এই সময়কালে বাংলায় শহরমুখী পরিযানের এই হিড়িক পড়ে গেল, যা বিদেশী ইংরেজদের যুগেও হয়নি? কেন বাংলার ৮০ শতাংশ পুকুরে আজ দেড়/দুশো গ্রামের বেশি বড়ো মাছ থাকতে পারে না? কেন ৪৬-৪৭ সালে অবিভক্ত বাংলার প্রতিটি গ্রামে ৩০ থেকে ৪০ রকমের ফসল হত (শাকপাতি বাদ দিয়ে), আর এই সময়ে হয় তিন থেকে চার রকমের? স্বয়ংস্পূর্ণ গ্রামকে পরাধীন করা হল কার স্বার্থে? জানি, আজকের এমন পণ্য বিস্তর আছে, যা দূর থেকেই আনতে হবে। কিন্তু যা হাতের কাছেই হতে পারে তাও পরিবহনযোগে পেতে হবে কেন? আবার বলি, কেন পঞ্চাশ বিঘের পুকুরের জল থেকে কুড়ি ফুট দূরের হাটে দু-চার কেজির মাছ পৌঁছাতে পারবে না অথচ সেই পুকুরের চারা মাছ দেড় হাজার মাইল দূর গিয়ে বড়ো হয়ে আবার ওই পুকুর পাড়েই ফিরে আসবে? এই অনাবশ্যক পরিবহন কার স্বার্থে? বৈশ্য সমাজের না, আত্মীয় সমাজের? দুই সমাজের স্বার্থকে কি মেলানো যায় না? এক সমাজকে মেরে আর এক সমাজকেই বাঁচাতে হবে শুধু? তাতে উভয়েই মারা পড়বে না তো শেষে?

রবীন্দ্রনাথ মেলানোর কথাই ভেবেছিলেন। বিগত সরকারের ক্ষমতা ছিল না রবীন্দ্রনাথকে বোঝার। তাঁদের জন্মনক্ষত্রে দোষ ছিল বলে ভাবতে বাধে। তাঁরা যে দর্শন নিয়ে গ্রামে ঢুকেছিলেন তা ছিল গৃহযুদ্ধের। প্রতিযোগিতা-প্রধান। ফলে জঙ্গলমহল ও পাহাড়ের সঙ্গে সাধারণ সব গ্রামই আজ হয়েছে শ্রীহীন, হতচ্ছাড়া। কিন্তু সহযোগিতা-প্রধান কর্মান্দোলনটি কী হতে পারে? কী মন্ত্রে গ্রামের মানুষ আবার অনুরাগে উদ্বোধিত,

উৎসাহে উজ্জীবিত হয়ে উঠতে পারে?

বিগত সরকারের প্রধান দলটি গ্রামে গ্রামে ঢুকেছিল প্রধানত ভূমিবন্টন ও বর্গা-আন্দলন - এই দুটি অস্ত্র নিয়ে। ভূমিবন্টন জিনিসটা খুব ভালো। কিন্তু উদ্বৃত্ত জমির পরিমাণ সেদিনের তুলনায় আজ খুব কম না হলেও। ওই পথে মানুষকে নতুন করে ছোঁওয়া যাবে নিতান্ত অল্প। বর্গা আন্দোলন জিনিসটা ছলনা ছাড়া কিছুই ছিল না। ওটি কম্যুনিজমকে ঠেকানোর তত্ত্ব বলেই নয় শুধু। গ্রামে গ্রামে দলতন্ত্রের মোক্ষম প্রতিষ্ঠায় ওই আন্দোলনটির ব্যবহার করা হয়েছিল আশ্চর্য কৌশলে। মোটামুটি ১৩ শতাংশ জমি বর্গা নথিভুক্ত করেই আন্দোলনটি স্থগিত করে দেওয়া হয়। গ্রামের একশো শতাংশ মানুষকেই বোবা অবস্থায় সমর্থকরূপে লাভ করবার উদ্দেশ্যে। কেমন করে? সে সব কথা অন্যত্র লিখেছি- এখানে পুনরুক্তি করব না।

এখানে বলবার কথাটি হচ্ছে, নতুন সরকার যেহেতু নতুন কোনও ছলনার আশ্রয় নেওয়াটাকে, যত দূর বুঝি, ভদ্রোচিত মনে করতে পারবে না, তাকে অগত্যা খুঁজতে হবে অন্য পথ - যা হবে সরল এবং আন্তরিক। এবং অবশ্যই সময়োচিত। অন্যথায় অনুকরণের কাল-গহ্বরে পড়ে হাবুডুবু খেতে হবে। এখনকার সমস্যাটি হচ্ছে বর্তমানে প্রচলিত রাসায়নিক কৃষি-পদ্ধতিটির দ্বারা বিধ্বস্ত হতে বসেছে সমগ্র কৃষি ব্যবস্থাটিই। ক্ষুদ্র চাষ বা পারিবারিক চাষকে ঘিরে যে ব্যবস্থাটি দাঁড়িয়েছিল। সতর্ক হবার উপায় থাকা সত্ত্বেও এতদিন তাকে বিধ্বস্ত হতে দেওয়া হয়েছে, সমগ্র কৃষি-ব্যবস্থাটিকেই কর্পোরেটকুলের হাতে সমর্পিত করার উদ্দেশ্যে। ম্যাকিন্‌সে কোম্পানি পরিবেশবান্ধব, সুস্থায়ী কৃষির দৃষ্টান্ত স্থাপনের কাজে লাগতে চলেছিল সরকারেরই মদতে। জলস্তর আরও নেমে গেলে, জমির উর্বরতা আরও একটু কমে গেলে, উৎপাদন আরও একটু পড়ে গেলে ওই সমর্পণের যুক্তিটাই হয়ে উঠত বৈধ। তারই জন্য এতদিন চলছিল যেন সাবধানী চেষ্টা। ক্ষুদ্র চাষকে এভাবে বিধ্বস্ত হতে দিলে এই বাংলার কম করে আরও এক কোটি মানুষকে কর্মচ্যুত হতে হবে।

প্রশ্নটা হচ্ছে, এই ক্ষুদ্রচাষকে সুস্থায়ী, পরিবেশ-বান্ধব এবং লাভজনক রাখা যায় কীভাবে। এই প্রক্রিয়ার এক দিকে থাকবে পরিবেশ-বান্ধব প্রকৃতির কৃষি-প্রযুক্তি, অন্যদিকে, ওই কৃষি-প্রযুক্তির উপযোগী সমাজ-প্রযুক্তি। কৃষি প্রযুক্তিটির বিরুদ্ধে বলবার কথা শুধু একটাই— ও পথে খাদ্যাভাব মিটবে কিনা। এর উত্তর তখনই না-বাচক বা হতাশা-ব্যঞ্জক হবে, যখন ওই প্রযুক্তির উপযোগী সমাজ-প্রযুক্তির সহযোগের আবশ্যিকতাকে উপেক্ষা করা হবে।

প্রাকৃতিক চাষ —যাকে কেউ কেউ শূন্য বাজেট কৃষি বলে থাকেন— কম পুঁজিতে চলতে পারে তখনই যখন তার উপযোগী সমাজ-প্রযুক্তির সহযোগটিও হবে শূন্য-বাজেট-সিদ্ধ, নিদেনপক্ষে,- স্বল্পব্যয়সাধ্য। এই সহযুক্ত কৃষি ও কৃষি সমাজ বাংলার মা-মাটি-মানুষের মহতী মঙ্গলে যে বিপুল ভূমিকা পালন করতে পারে, তারই পরিকল্পনা ধরা পড়েছে আমাদের 'নয়া তেভাগা' আন্দোলন সংক্রান্ত প্রস্তাবে। ইংরেজিতে একে বলা হয়েছে, Auto-functional Green Movement। এই প্রস্তাবে বৈশ্য সমাজ যত লক্ষ চাকরি দিতে পারবে

তার থেকে কত বেশি সংখ্যক স্ব-নিযুক্তি ঘটাতে পারবে, আত্মীয়-সমাজ —তারই প্রতিযোগিতার আহ্বান করা হবে। পুরনো তেভাগা-আন্দোলন ছিল প্রায় প্রতি ভূমি-মালিকমাত্রেরই স্বার্থবিরোধী। এই তেভাগা আন্দোলন, যার জমি আছে এবং নেই — উভয়ের স্বার্থেরই পোষকতা করে উদঘাটন করতে চায় গ্রামীণ গণতন্ত্রের একটি আদর্শকে, তার অনন্ত সম্ভাবনাকে। আমাদের এই প্রস্তাবের অকুণ্ঠ সমর্থক ছিলেন মনীষী অম্লান দত্ত। অধ্যাপক অশোক সেন, যিনি বিদগ্ধ এবং সৎ বামপন্থীরূপেই সম্মানিত, কিছু প্রশ্নসহ এগিয়ে এসেছেন প্রস্তাবটির সমর্থনে। আই.আই.পি.এম এর প্রাক্তন ডিরেক্টর অধ্যাপক মলয় চৌধুরীও সক্রিয় সহযোগিতার আশ্বাসসহ উৎসাহিত করেছেন আমাদের। রাজ্য উচ্চশিক্ষা বিভাগ কেবল সচিব স্তরের সিদ্ধান্তের দ্বারা চালিত হয়ে রাজ্যের ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়কেই লিখিত নির্দেশে জানিয়েছেন, তাদের জাতীয় সেবা প্রকল্পের মাধ্যমে প্রস্তাবটির অনুসরণে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে। কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ই এখনও পর্যন্ত প্রাথমিক তৎপরতাও দেখাতে পারেনি। জানি না, এ অবাধ্যতা কোনও সাংবিধানিক সংকট ডেকে আনবে কিনা।

কী কী এর বৈশিষ্ট্য

এক, আন্দোলনটি সংগঠিত হবে খুব কম বা খুব বেশি সংখ্যক মানুষকে নিয়ে নয়। কম-বেশি হাজার জন সংলগ্ন গ্রামবাসীর হাজার জনকে নিয়েই, কাউকে বাদ দিয়ে নয়।

দুই, ২৫/৩০ জনের একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে সর্ব সম্মতিক্রমে। ৫০ থেকে ১০০ একটি কর্মীবাহিনী গড়ে তুলবেন এঁরা। অবশ্যই সর্ব সম্মতিক্রমে। যাঁদের জমি আছে এবং নেই —এই দুই পক্ষের মাঝে একটি মধ্যবর্তী মঞ্চরূপে কাজ করবেন এঁরা।

তিন, সকলেই কিছু না কিছু চাঁদা দেবেন। শ্রম, অর্থ ও জমি - যে কোনও একটি, দুটি বা সব ক'টিরই মাধ্যমে।

চার, এঁরা কাজ করবেন (প্রথমত গাছ লাগানোর) শুধুমাত্র অব্যবহৃত এবং অল্প ব্যবহৃত জায়গায় —প্রধানত, রাস্তার ধার, খালের ধার, বিলের ধার, নদীর ধার, রেলের ধার, পুকুর পাড় এবং সাধ্যমত জমির আলের একটা ধারে। কৃষি কেন্দ্রিক শিল্পের সম্ভাবনা উদঘাটনে অংশগ্রহণ করবে। অব্যবহৃত জলায় এবং ধানের জমিতেও মাছ চাষ করবে। তাঁদের লিখিত ঘোষণা থাকবে যে, তাঁদের কাজের কোনও জায়গারই দখলদার নন তাঁরা, পাহারাদার মাত্র। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি 'নতুন গ্রাম ঃ অন্য পথে' গ্রন্থে।

পাঁচ, 'ব্যবহৃত' জমিতে ব্যক্তি চাষীর ফসলের পাহারার দায়িত্ব নেবেন এই মঞ্চ বা বাহিনী। প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনের ক্ষেত্রেও শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় জায়গায় সাহায্য করবে মঞ্চ। এ সব যথাযথ ব্যবস্থা হলে যে কোনও লাভজনক, মূল্যবান চাষেরও সুযোগ পাবেন ব্যক্তি চাষী। কাজে কাজেই, বিচিত্র চাষের - স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি বিচিত্র চাষের —পথ খুলে যাবে। ক্ষুদ্র চাষ ব্যাপক সুরক্ষা পাবে।

ছয়, পাহারার একটা অংশ গোরু-ছাগলের উৎপাত রোধ করা হলে, তাদের খাদ্য যোগানের ব্যবস্থাও হবে এই মঞ্চের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

সাত, এই পদ্ধতিতে উৎপাদনে বেগ সৃষ্টি করে সংগঠিত গ্রামের প্রতিটি ব্যক্তিকে, বিশেষত যাদের বছরে দশ কেজি করে মাছ এবং প্রাথমিকভাবে দশটি করে (ছোট বড় মিলিয়ে) গাছ দেওয়ার ব্যবস্থা করবে এই মধ্যবর্তী মঞ্চ।

আট, একটি নতুন পদ্ধতিতে বৃষ্টির জল ধারণের পরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করবে এই মঞ্চ। ইজারয়েলের মত প্রায় প্রতি জমিতে জলের ট্যাঙ্ক বানানো পুঁজি সাপেক্ষ ও দূষণ-সম্ভব বলে, ৫০/১০০ বিঘে জমির মধ্যে নিচুতর ৫/১০ বিঘে জমির বিভিন্ন অংশকে উচুঁতর, কম-উঁচু এবং বেশি-নিচুতে পরিবর্তিত করে প্রচুর জল ধারণের এবং রকমারি ফসলের সুযোগ-সৃষ্টি সম্ভব। মাটির তলা থেকে জল তুলে বিক্রি করার ব্যাপারে সরকার তার সহায়তা অকৃপণভাবে বিতরণ করে চলেছে ব্যক্তি বিশেষকে। কিন্তু বৃষ্টির জল ধারণ করে তাতে মাছ চাষ করে এবং প্রয়োজনমতো জল বিক্রি বা বিশেষ করে বিনিময় করে লাভ করার ব্যাপারে সমাজ কী সাহায্য করতে পারে ব্যক্তিকে, সে-সম্ভাবনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করবে মঞ্চ। দূর করবে তার বাধা।

নয়, অব্যবহৃত এবং অল্পব্যবহৃত জায়গায় বিচিত্র চাষ করে মালিক ও মজুরদের আয়-উৎপাদন বাড়িয়ে দেওয়ার শর্তেই সেই বাড়তি উৎপাদনের তিনভাগের এক ভাগ গ্রহণ করবে এই মধ্যবর্তী মঞ্চ। ভাগের পরিমাণের রকমফের কিছু হবে কিনা তা নির্ধারিত হবে স্থানীয়ভাবেই। এই পদ্ধতিতে উৎপাদনে সাফল্য আনতে পারলে, হাজার জনের মধ্যে খুব খুব কম করেও স্বনিযুক্তি ঘটবে অন্তত পঞ্চাশজনের। পরিণামে ছ'কোটি গ্রামবাসী বাঙালির মধ্যে সংখ্যাটা হেসে খেলে দাঁড়াবে ত্রিশ লক্ষ। স্কুল-কলেজ, মন্দির-সমজিদ-গীর্জা-হাসপাতালকেও ব্রতী করা যেতে পারে এই শুভকর্ম যজ্ঞে।

দশ, একশো দিনের কর্মসূচীটি - চুরি-ডাকাতির কথা বাদ দিলে — মূলত যান্ত্রিকভাবে পরিচালিত। ওই টাকার দশ থেকে বিশ শতাংশ এই প্রক্রিয়ায় উৎপাদনমূলক সৃষ্টিশীলভাবে ব্যয় করে একশো দিনের কাজকে একই টাকায় তিনশো দিন পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা যায় কিনা, তার পরীক্ষাও করা যেতে পারে এখানে। এ ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক।

বক্তব্যের বিন্দু-সংখ্যা আপাতত বাড়ব না। কিন্তু একটু ভিন্ন প্রসঙ্গ হলেও এখানে উল্লেখ না করে পারছি না যে, মহাত্মা গান্ধির নামে একশো দিনের কাজের যে প্রকল্পটি চালু হয়েছে, তার পেছনে যত সদিচ্ছাই থাক, কার্যক্ষেত্রে তা ক্ষুদ্র ব্যবসা ক্ষুদ্রচাষকে ও ব্যর্থ — কাজে কাজেই লুপ্ত — করতে উদ্যত হয়েছে আজ। সারা ভারতের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, যদি এক্ষুনি প্রয়োজনীয় সংশোধন না করা হয়, সৃষ্টিমূলকভাবে ব্যবহারের রাস্তা খোঁজা না হয়, তবে মহাত্মা গান্ধির নাম নিয়ে মহাত্মা গান্ধির সাধের গ্রামকে ধ্বংসই করা হবে। এইখানে সবিনয়ে একটা কূট প্রশ্নও করে রাখি ঃ নরেগা-প্রকল্প শুধু গ্রামেই বেশি করে চালু হল কেন? শহরে কি বেকার তেমন নেই? বৈশ্য সমাজের হয়ে কোনও আগ্রাসিতার প্রকাশ এখানে ঘটছে কি?

প্রবহমান মঙ্গলে মমতা

যত দূর বুঝি, মমতার মধ্যে দুই সমাজের শক্তিই হয়েছে সম্মিলিত। চৈতন্য নাগরিক সমাজের বৈশিষ্ট্য

যুক্তিকে তথা ন্যায়-মীমাংসা সম্পর্কিত চেষ্টা-চর্চাকে বা তার জড় অভ্যাসকে ত্যাগ করে ছিলেন হেলায়। যে ভক্তিকে তিনি আশ্রয় করেছিলেন, তা ছিল আত্মীয়-সমাজেরই শক্তি। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যুক্তিবাদের যে ক্ষুরধার প্রকাশই ঘটে থাকুক, উভয়ের সমন্বয় ঘটে থাকুক যত সুন্দরভাবে, এ কথা মানতেই হবে যে, রবীন্দ্রনাথেরও জোরটা পড়েছিল আত্মীয়-সমাজ শক্তির সম্ভাবনা উদঘাটনের দিকে।

আজ বৈশ্য-সমাজ-শক্তি তার প্রধর্ষী আগ্রাসিতায় এক ভয়াবহ ও বিস্ফোরক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে সারা বিশ্বেই। ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক মৌলবাদের তথা তালিবানের আবির্ভাব তারই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মাত্র। আত্মীয়-সমাজ-শক্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ শুশ্রূষাই দূর করতে পারে মানুষের বহু কষ্ট। প্রকৃতি, পরিবার ও সমাজ (আত্মীয়)— মানুষের এই তিন আশ্রয়কে তছনছ করার শক্তিতেই বৈশ্য সভ্যতা আজ এতটা ক্রম প্রসারণশীল। মনে হয়, এই তিনের আশ্রয়চ্যুতির পরিমাণ অনুপাতেই বেড়েছে জঙ্গলমহল কিংবা গোর্খাল্যান্ড সমস্যা তথা সমগ্র গ্রাম-বাংলার শ্রীহীনতা। এই সার্বিক শ্রীহীনতার বিরুদ্ধে খড়্গহস্তা হয়ে দেবী দুর্গার মতই যেন মমতা আজ আবির্ভূতা হয়েছেন মহামাতৃরূপে। ড. রমা কুন্ডু ও জয় গোস্বামী চমৎকার বলেছেন, ঈশানী পাড়ার নন্দিন্-রূপে। সিপিএম এখানে নিমিত্ত মাত্র। সে অন্ধভাবে আত্মসমর্পণ করেছে উগ্রভাবে বেড়ে ওঠা এক মহা পাপশক্তির কাছে। যে-পাপশক্তি এখন 'মরুভূমির মত যাকেই জড়িয়ে ধরে সেই যায় শুকিয়ে'।

তার থেকে বাংলাকে উদ্ধারের ব্রত গ্রহণ করেছেন মমতা। আবহমান বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে উঠতে পারবেন তিনি যে পথে, সেই দিকেই তাঁর স্বাভাবিক ঝোঁক। কিন্তু যে প্রকৃত-পরিবার সমাজ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, তাকে আর কখনোই হয়ত ফিরে পাওয়া যাবে না তার পূর্বরূপে। তবু আত্মীয়-সামাজিকতার স্নিগ্ধ আতপত্রটিকে, তার অপার সামর্থটিকে, অন্য অন্য রূপেও যদি সম্প্রসারিত করার কাজটিকে তিনি অগ্রসর করে নিয়ে যান এবং আমাদের মত স্বপ্ন দেখা-সার মানুষের স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে তিনি আরও একটু সচকিত হয়ে ওঠেন, তাহলে বাংলা যার-পর-নাই উপকৃত হবে। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, এই বিষণ্ণ বসুন্ধরা বিনাশের আগে যদি আরও একটি নবজাগরণের মুখ দেখতে পায়, সেটা দেখতে পাবে গ্রাম-বিশ্বেই। চিরন্তনতার সঙ্গে অদ্যতনতার সচিন্ত্য সহযোগেই যা জাত হতে পারে।

'মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়ত আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে'।— বলে বিদায়ের আগে আকুল আশায় বুক বেঁধেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সূর্যোদয়ের এই দিগন্তে ঘাসফুল হাতে মা-মাটি-মানুষের বার্তা নিয়ে মমতার আবির্ভাব কঠোর পৌরুষের জয়ধ্বনিতে ভরা যন্ত্রবাদী সভ্যতার বুকে মাতৃবাদী, প্রকৃতিবাদী ভাবনার একটি অভিনব অধ্যায়ের সূচক বলেই বিশ্বাস করি, আশাকরি। বিজয়ের বিপুল আনন্দে সাধারণের পক্ষে যখন অহঙ্কারে মদমত্ত হওয়ার কথা, মমতা তখন বিষণ্ণ, অশ্রুসজল। চরম লড়াকুর এই পরম বিকাশটুকু না দেখলে বোঝা যেত না কোন্ মহাভাবের দ্বারা চালিত তিনি, তাঁকে 'পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায় কোন খ্যাপা সে'। বিশ্বাস করতে চাই, সিপিএম বলে একটা দল ছিল বলে যখন মনেও করতে পারবে না মহাকাল, মমতা তখন দুই সমাজের মিলনের সফল সাধিকা হয়ে ঘরে ঘরে আদৃতা হচ্ছেন মা-মমতারূপে।

দেশে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের সার্থক পথ দেখাতে পারে ভারতীয় রেল

প্রথম সবুজ বিপ্লব খাদ্য সঙ্কটের সুরাহা করেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু তা ছিল নিতান্ত সাময়িক। ধান উৎপাদন বিঘাপ্রতি দশমণ থেকে প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু কয়েক দশকেই তা কমে ১২/১৪ মণে নেমে এসেছে। আশঙ্কা, আরও নামতে পারে।

বিশ্বের নিরিখে আরও গুরতর আশঙ্কার কারণ ঘটেছে ইতিমধ্যেই। আগামী পঞ্চাশ বছরে কৃষিজমির সঙ্কোচন ঘটবে প্রায় ৪০ শতাংশ, অথচ ওই সময়ের মধ্যে বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে অন্তত আরও দুশো কোটি। বুঝতেই পারা যায়, খাদ্য সমস্যাই হবে আগামী দশকগুলিতে বিশ্বের সব থেকে গুরুতর সমস্যা।

সমস্যা সমাধানের প্রাথমিক শর্ত, সমস্যার কারণকে বোঝা। সন্দেহ নেই, গত দু-আড়াইশো বছরের শিল্পায়নের ধরনে এমন কিছু ছিল, যা পৃথিবীতে ডেকে এনেছে দুটি ভয়ঙ্কর সমস্যা। এক, অসাম্যজনিত। দুই, পরিবেশসংকট জনিত। সম্পদের অতিপুঞ্জীভবন ও যন্ত্রনির্ভরতা মাথা-পিছু শক্তির ব্যবহার বাড়িয়েছে বলেই দেখা দিয়েছে বিশ্ব উষ্ণায়নজনিত সমস্যা। এই সমস্যারই পরিণামে সমুদ্র ও মরুভূমির যুগপৎ বিস্তারের সম্ভাবনা। ৪০ শতাংশ অন্যতম বিপদ সেই কারণেই।

প্রথম সবুজ বিপ্লবের কৃষি পদ্ধতিও পূর্বোক্ত সমস্যা দুটিকেই করেছে তীব্র। সেই পদ্ধতিকে বাতিলের প্রশ্ন উঠেছে, সেই কারণেই। অনেকের ধারণা, প্রথম সবুজ বিপ্লবে অবলম্বিত প্রযুক্তি জল, মাটি তথা পরিবেশের দিক থেকে বিপর্যয়কর বলেই তা পরিত্যাজ্য। সেটা কঠিন সত্য ঠিকই কিন্তু অর্থনৈতিক শোষণের প্রশ্নটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং মাটি যত দূষিত, জল যত দুর্লভ ও দুর্মূল্য হচ্ছে, ততই বাড়ছে কোম্পানিকুলের মুনাফা। এবং দরিদ্রতর হচ্ছে চাষি। এই রাজ্যে, শুধু আলু চাষে, চাষির হাত থেকে ছিনতাই হয়ে যাচ্ছে বিঘা প্রতি ১০-১২ হাজার টাকা। সব চাষের উৎপাদন ব্যয় বাড়ছে, উৎপাদন ও লাভের পরিমাণ কমছে প্রচলিত কৃষিপ্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে।

সঙ্গতভাবেই প্রসঙ্গ উঠেছে পুনরায় কৃষিপ্রযুক্তি পরিবর্তনের। এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট হয়েছে দুই ধরনের পথ। একটি কোম্পানি নির্ভর জিন প্রযুক্তির পথ, অপরটি প্রাকৃতিক প্রযুক্তির। জিন-প্রযুক্তির পক্ষে মুখরিত কোম্পানিকুলের কোটি কোটি টাকার বিজ্ঞাপন। হয়তো নানা মহল থেকে এই প্রযুক্তির পক্ষে উচ্চারিত অথবা অনুচ্চারিত সমর্থন থাকবে। ফলে প্রতিবাদ আন্দোলনও তার বিরুদ্ধে, গড়ে উঠবে এটা বোঝাও সহজ।

জিন-প্রযুক্তির পক্ষে কাজ হবে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে, সাংগঠনিকভাবে। প্রাকৃতিক প্রযুক্তির পক্ষে শুধু প্রচার-প্রতিবাদ সেই সংগঠিত পুঁজিবহুল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছুতেই যথেষ্ট হতে পারে না। বিকল্প কৃষি প্রযুক্তির জন্য জরুরি সমাজপ্রযুক্তি বা সংগঠনতন্ত্রের আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা।

সে বিষয়ে উদ্যোগী না হয়ে শুধু প্রতিবাদ আশ্রয়ী হলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হবে, তা পূরণ করার জন্যে কোম্পানিনির্ভর হয়ে ওঠার যুক্তিটাই বৈধ হয়ে উঠবে। ফলে প্রতিবাদের প্রাবল্যে আসবে বিকটতর হিংসা।

তাতে না কোম্পানি, না কৃষককুল - কারোরই ভালো হবে। কাজে কাজেই দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে সেটা চূড়ান্তভাবেই বিপর্যয়কর।

প্রশ্ন উঠতে পারে, রেলের মতো পরিবহণ পরিষেবামূলক প্রতিষ্ঠান কৃষিকাজ হাতে নেবেন কেন? আসলে রেলকে যে নিজে বেশি কিছু করতে হবে তা নয়। আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী, নয়া তেভাগার বিধিমতে যে ব্যবস্থায় রেলের অব্যবহৃত কৃষিজমির পরিচালনা এখন চলে, সেই ব্যবস্থাটিকে নতুন পরিকল্পনা-অভিমুখী করে তুললেই কাজ চলতে পারে। অভিমুখী করবার জন্যে পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণের উপযোগী কয়েকটি কেন্দ্র নিশ্চয়ই গড়ে তুলতে হবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। গড়তে হবে একটি প্রধান কার্যালয়ও। সেটা বাংলায় হলে অন্যের ঈর্ষার কারণ ঘটবে না বলেই বিশ্বাস। কারণ, সেটা হবে রেলের হাত দিয়ে সারা ভারতকে বাংলারই দেওয়া মস্ত বড় একটা উপহার। যদিও কাজটি নিজের মাটিতে এখনই এই বিকৃত বাম শাসনে বাস্তবায়িত করতে বাংলা সর্বোত্তমভাবে প্রস্তুত কিনা, সেটা বলা শক্ত।

বর্তমানে রেলের জমির কৃষিসংক্রান্ত ব্যবহারও এক ধরনের তেভাগা রীতিতেই পরিচালিত। রেল একজন ঠিকাদারকে প্রায় ৫০ কিমি জায়গা দেয়। সেই ঠিকাদার লিজ দেন ছোট ছোট চাষিকে। এই তেভাগা পদ্ধতিতে রেল, ঠিকাদার ও ক্ষুদ্র চাষি- কারোরই বড় একটা লাভ হয় না। রেলের ধারের সাধারণ চেয়ো বা জলাতে মাছ চাষ হয় না বললেই চলে। কোথাও কোথাও হয় হয় পানিফল। গাছ বলতে মূলত জ্বালানির উৎপাদন। এর বাইরে হয় কিছু ধানের চাষ। সব মিলিয়ে ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনায় বিচ্ছিন্নভাবে যা কিছু চাষ হয়, তা প্রত্যাশার তুলনায় করুণভাবে কম।

রেলের ভূমি-ব্যবস্থাপনার এই ধরনটি বিশেষভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। এই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাই ব্যক্তিস্বার্থরক্ষার সব থেকে অন্তরায় হয়ে উঠেছে। এই পদ্ধতিতে ৫০ কিমি রেল পথের দুই পাশের জমিতে ৫০০ জনের বেশি মানুষ যুক্ত থাকেন না সাধারণত। এবং একজন ছাড়া কারোরই জীবিকার সুরাহা সুষ্ঠভাবে হয় না। অপর দিকে, ওই একজন বা পাঁচশোজনের নিযুক্তি, নানা অস্বচ্ছ পথেই হয়ে থাকে কিনা, তার থেকেও গুরুতর প্রশ্ন আছে। প্রথম কথা, এই পদ্ধতিতে সব জায়গায় সর্বোত্তম সদব্যবহার হয় না। দ্বিতীয় কথা, সেই জন্যেই পরিবেশ সুরক্ষায় রেলের ভূমিকাও শোচনীয়ভাবে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

আসল কথা, এই পদ্ধতির মধ্যে কোনও স্বপ্ন নেই। কী স্বপ্ন দেখতে পারে রেল এবং কোন পথে তা কিছুটা বাস্তবায়িত হতে পারে এ বিষয়ের আলোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক। এককথায়, দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে পারে রেল। নেতৃত্ব দেওয়ার সময় শুধু দেখতে হবে, এই বিপ্লব যেন বোবা প্রকৃতির পক্ষ নেয় এবং তারই কোলে আশ্রিত তারই মতো বোবা ও সুন্দর মানুষের পক্ষ নেয়। সংক্ষেপে মা-মাটি-মানুষের পক্ষ নেয়।

দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব কোন পথে, এ নিয়ে ভেতরে ভেতরে একটা মারকাট লড়াই আছে। এক, কর্পোরেটায়িত পথে, দুই প্রাকৃতিক পথে, —সাধারণের দ্বারা। রেল কর্পোরেট সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই না

করেও, মানুষের পাশে থাকতে পারে, থাকতে পারে সংহতি ও সম্প্রীতির পক্ষে। শুভ সাম্য যতদিন না আসছে ততদিন সাম্যের নামে চটুল চাতুর্যের পথে না গিয়ে আমরা দেখতে পারি সমন্বয়ের শক্তিকে পরীক্ষা করে। শুধু রেলের লক্ষ লক্ষ একর জমিতে নয়, তার বাইরে ব্যক্তিগত জমিতেও প্রাকৃতিক চাষ কত সুন্দর হতে পারে, সার্থক হতে পারে কত বিচিত্র পথে, সে সম্পর্কে দিশা মিলতে পারে ক্রমিক পরীক্ষার পথে, উদ্ভাবন করতে পারে তার উপযোগী সমাজ ও অধ্যাত্ম প্রযুক্তি।

আপাতত সমাজ প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। রেলের কৃষি জমি পরিচালনায় তেভাগার প্রচলিত পদ্ধতিটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যক্তিস্বার্থ বিরোধী, প্রকৃতিস্বার্থ বিরোধী হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে। আমরা তাই নয়া তেভাগা প্রকরণ-সংকলিত সমাজ প্রযুক্তিগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি প্রস্তাব দিতে চাই।

এক ঃ এই পরিকল্পনায় রেল, মঞ্চ (যাকে রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে আমরা নাম দিয়েছি আত্মীয়সমাজ মঞ্চ) এবং মজদুর -এই তিনটি পক্ষ। মঞ্চটির ব্যাখ্যামূলক নাম দেওয়া যেতে পারে স্বয়ম্ভর সবুজ সমাজ যার ইংরেজি হতে পারে Self-help Green Society বা সংক্ষেপে SHGS। মালিকরূপে রেল বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একটি মঞ্চের হাতে ৫ থেকে ১০ কিমি পথের পার্শ্ববর্তী এলাকার দায়িত্ব দেবে। ভবিষ্যতে মঞ্চের কাজ যখন সংলগ্ন ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতেও বিস্তার লাভ করবে তখন মঞ্চকে দেওয়া রেলের জমির পরিমাণ দুই বা এক কিমি দৈর্ঘ্য পর্যন্ত কমিয়ে আনার দরকার হবে। দরকার হবে আরও বেশি মঞ্চের সক্রিয়তা। দারিদ্রসীমার নীচের তলার সব মানুষকে দিয়ে শুরু করে ওপর তলা পর্যন্ত যখন বিস্তার করা হবে সহযোগিতার আদর্শ।

দুই ঃ আত্মীয় সমাজ মঞ্চ প্রথমে সংলগ্ন সব দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের তালিকা গ্রহণ করবে। তাদের প্রত্যেকের যাতে একটি বড় (যথা, আম, জাম, লিচু, সবেদা, কাঁঠাল, নারকেল, কুল প্রভৃতি) দুটি মাঝারি (যথা পেঁপে, কলা, লেবু, আতা, সজনে, সুপুরি) ও পাঁচটি ছোট (যথা লঙ্কা, বেগুন, লাউ, কুমড়ো, শিম, গোলমরিচ, হলুদ, জিরে, মৌরি, আদা, আমআদা) গাছগাছড়া পেতে পারে তার ব্যবস্থা করবে। দেখবে স্থানভেদে মাছও যাতে চাষ করা যায়। অস্থায়ী চালায় গোপালনের ব্যবস্থাও করতে পারে, যা একই সঙ্গে হবে সামাজিক ও ব্যক্তিগত।

তিন ঃ প্রাকৃতিক কৃষির প্রধান প্রয়োজন কৃষি-বৈচিত্র্য। কৃষিতে বৈচিত্র্য মানেই বছর জোড়া সুরক্ষার দায় এসে পড়া। সুরক্ষা উৎপেতে মানুষ থেকে ছাড়া পশু থেকে সকলের সবুজের অধিকারের স্বীকৃতি সুরক্ষার প্রথম ধাপ নিশ্চয়ই। দ্বিতীয় ধাপ, পশুদের পরিসংখ্যান গ্রহণ করে, তাদের বছরজোড়া খাদ্যের উৎপাদনের ব্যবস্থা। তা বিক্রি বা বিনিময়ের ব্যবস্থা। তৃতীয় ধাপ, লোক নিযুক্ত করে পাহারার ব্যবস্থা করা যে কাজে অশক্ত ও প্রতিবন্দীদেরও আংশিক ব্যবহার সম্ভব। চতুর্থ ধাপ, তবুও কিছু কিছু বেড়ার ব্যবস্থা করা, যেখানে খাদ্যের প্রয়োজনে নয় বেড়ানো বা বিনোদনের বা কাজের প্রয়োজনে বিহারের দরকার হবে পশুদের।

চার ঃ একটি মঞ্চের সক্রিয়কর্মী সংখ্যা ৫০ থেকে ১০০ জন হওয়াই ভালো। মোট সদস্য সংখ্যা ৫০০ থেকে ১৫০০ জন। সদস্যদের ন্যূনতম শ্রম বা অর্থের সাহায্য গ্রহণ করবে মঞ্চ পরিকল্পিতভাবে। তাঁদের মাসে মাত্র

২/৪ দিনের শ্রমদানই যথেষ্ট হতে পারে। পূজো বা অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য যেমন, এই কাজের জন্যেও বৃহত্তর সমাজের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করবে মঞ্চ। বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদানের দিনে আহারের আয়োজনের জন্যে ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য।

পাঁচ ঃ নয়া তেভাগা ব্যবস্থায় জমির মালিক হিসেবে রেলের আয় বাড়তে পারে ন্যূনতম পাঁচ থেকে দশ গুণ। ৫০ কিমি দীর্ঘ পথে একজন ঠিকাদারের জায়গায় ১০০ জন মঞ্চকর্মী জীবিকায় পূর্ণ প্রতিষ্ঠা পেতে পারেন। আর আংশিক প্রতিষ্ঠা পেতে পারেন, ৫০০ জনের জায়গায় প্রায় ৫০ হাজার জন। ব্যক্তিগত কৃষিজমিতে ব্যক্তিমালিকের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চাষের ক্ষেত্রে মঞ্চের সহযোগিতা যখন সম্প্রসারিত হবে - সুরক্ষা বাজারজাতকরণ বা প্রক্রিয়াকরণে - তখনই দেশে জাগবে সবুজের সুস্থায়ী মহাবিপ্লব।

ছয় ঃ প্রাকৃতিক সার ও কীটতাড়ক সরবরাহ করার আয়োজন হবে মঞ্চের অন্যতম কর্মসূচি। এই কর্মসূচীর ফলে ক্ষুদ্র বা পারিবারিক চাষ প্রভূতভাবে উপকৃত হবে। রাসায়নিক পদ্ধতির চাষের ফলে চাষীর সম্পদ যা শোষিত হয়ে যায়, শোনা যায়, তার পরিমান নাকি ভারতবর্ষের মোট বার্ষিক বাজেটেরও দ্বিগুণ! আরও মাপসই একটা হিসেব দিতে পারি। এদেশে কোনো জমিতে ২/৩ বার চাষ ঐ পদ্ধতিতে হলেই এক বিঘা জমিতে চাষীর খরচা হয় খুব কম করে পাঁচ হাজার টাকা। তার থেকে মাত্র এক হাজার টাকা যদি ঐ মধ্যবর্তী মঞ্চকে দেওয়া হয় তাহলে প্রশিক্ষণসহ প্রাকৃতিক চাষের উপকরণাদি সরবরাহ করে মঞ্চ নিজের এবং রেলের পাশের জমি মালিকদেরও প্রভূত উপকার করবে। তোলাবাজি নির্ভর অসার রাজনীতির অবসানের রাস্তাও হয়তো এপথেই ক্রমশ প্রস্তুত হয়ে উঠবে।

সাত ঃ বর্তমান তেভাগা তত্ত্বে সংঘাতের বদলে জোর দেওয়া হয়েছে সমন্বয়ে, বিদ্বেষ ও বিচ্ছেদের বদলে সম্প্রীতি ও সহযোগিতায়। সর্বোপরি, সমাজের জন্য ব্যক্তিকতায় নয়, ব্যক্তির জন্য সামাজিকতায়। বিশেষত, অংশ-সামাজিকতায়। কর্পোরেট সংস্কৃতির সর্বব্যাপী বৈধতার দাবির বিপরীতে যে ব্যবস্থার ভূমিকা হতে পারে সুদূরপ্রসারী ও অতীব সৃষ্টিশীল। যেখানে ব্যবসায়িক সমাজ সংস্কৃতির চূড়াস্পর্শী সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতার শ্বাসরোধী গিরিখাত দেখার পর, আত্মীয় সমাজ-সংস্কৃতির শক্তিকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সদব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যাবে।

আট ঃ এইভাবে রেল কৃষি ও কৃষিকেন্দ্রিক শিল্পের নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রভূত সাফল্য পেতে পারে। এই মুহূর্তে বলতে পারি, উত্তর প্রদেশের অন্যান্য শুষ্ক জায়গায় যে প্রচুর খেজুর গাছ আছে, তার থেকে গুড় বানানোর ব্যবস্থা সূচনা হিসেবে মন্দ না হতে পারে। প্রায় বিনা আয়াসে আরও প্রচুর খেজুর গাছ লাগিয়ে রেল নীর-এর মতো রেল গুড় রেলের এক অন্যবদ্য সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারে একদিন যা আন্তর্জাতিক বাজারেও উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে।

নয়ঃ সীমিত ক্ষেত্রে, প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটি ব্যবস্থাপকমন্ডলী গঠন প্রয়োজনীয় হবে। গবেষণা ও তার প্রয়োগে যা ভূমিকা হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর অন্ধকারময় মহা দুর্যোগের দিনে ভারতীয় রেল আজ এগিয়ে আসতে পারে আলোকেরই বর্তিকা হাতে। এমন দিশা দেখাতে পারে, যার ফলে প্রায় সত্তর কোটি গ্রামবাসী ভারতীয় প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে উপকৃত হতে পারে প্রভূতভাবে গতির প্রাবল্যে এবং ভোগের আড়ম্বরে আমাদের সত্তা যখন কিছুটা হতবুদ্ধি ও স্থূল হয়ে গেছে - তখন এই সৃষ্টিশীলতার দীক্ষা পরম উপাদেয় হয়েই দেখা দেবে আমাদের কাছে!

সঠিক 'না' টি বলেছেন মমতা, সঠিক 'হ্যাঁ'-টি কবে বলবেন?

দেশ এখন পরিবর্তনের খুব বড় একটা বাঁকে এসে পৌঁছেছে। এই রকম এক একটি বড় বাঁক দেখা দিয়েছিল ১৭৫৭ সালে অথবা ১৯৪৭ সালে। খুচরো ব্যবসায় বিদেশী লগ্নির প্রসঙ্গটাতেই আসতে চাইছি আমরা। সম্ভাব্য এই লগ্নির সূত্রে দেশে যে পরিবর্তন আসবে তা আগের কোনও পরিবর্তনের থেকেই কম জোরালো নয়। সাতাশ লক্ষ কোটি টাকার খুচরো ব্যবসার বাজারটিকে দখলের লোভ ও লালসা অত্যন্ত সংগঠিতভাবে, অত্যন্ত মেপে পা ফেলে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু আপাতভাবে মনে হবে বিদেশি বিনিময়ের প্রয়োজনটা মানুষের মঙ্গলের জন্য কিছুটা আকস্মিকভাবেই দেখা দিয়েছে যেন।

মনে হয়, ভ্রামাত্মক কেন্দ্রায়নের স্বাভাবিক পরিণামেই ঘটেছে এই রকম ভ্রমাত্মক বিশ্বায়নের পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে খুচরো ব্যবসা শুধু নয়, মহা সংকটে পড়েছে খুচরো চাষ বা পারিবারিক চাষও। কিন্তু এসব ঘটছে আকস্মিকভাবে নয়— সুনির্দিষ্ট কার্যকারণযোগে। সেগুলিকে অলাভজনক করে তোলবার এক একটা প্রকল্পই যেন গড়ে তোলা হয়েছে। যা হোক, এই ঐতিহাসিক বাঁকের পর্বে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত দৃঢ় ভূমিকা নিয়েছেন। বাতিল করেছেন বিদেশি বিনিময়ের প্রস্তাব। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পদত্যাগ করেছেন। এইটা খুব বড় কথা, আনন্দের কথা।

কিন্তু এইরকম একটি সংগঠিত উদ্যোগের প্রতিক্রিয়া হিসেবে একটি দৃঢ় 'না' বলাই কি যথেষ্ট? সন্দেহ নেই এমন একটি সিদ্ধান্তে মমতা যে পৌঁছতে পেরেছেন, সেটা তাঁর পরম গুণ। কিন্তু একটি সংগঠিত ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াটাও সংগঠিত হওয়া উচিত নয় কি? সেই ব্যাপারে মমতার আত্মপ্রস্তুতি কই? মমতার মধ্যে তার প্রস্তুতি যে এক রকমের ছিল, তার প্রমাণ আমার কাছে। মানবপ্রেমিক পান্নালাল দাশগুপ্তকে লেখা মমতার একটি স্বহস্তলিখিত চিঠিতে। তখন তিনি যুবকংগ্রেসের সভাপতি। সেখানে তিনি স্পষ্ট করেই বলেছিলেন বিকল্প অর্থনৈতিক মডেল তৈরির কথা। যেখানে গান্ধি-রবীন্দ্রনাথ ও পান্নাবাবুর চিন্তার ছায়া থাকবে। যেখানে তৃণমূলে বাস করা আপামর সাধারণের জীবন-জীবিকার সুনিশ্চিতকরণের পরিকল্পনা থাকবে।

ইতিমধ্যে মমতা ক্ষমতার কেন্দ্রে এসেছেন। এবং তাঁর চারপাশে তৈরী হয়েছে কেন্দ্রায়িত ক্ষমতার কালচার। এঁদের অনেকেই উন্নততর বামফ্রন্টের মতো উন্নততর বামপন্থার প্রবক্তা। সন্দেহ নেই, চিন্তার ইতিহাসে বামপন্থীদের স্থান যথেষ্ট উঁচুতেই। এঁরাই সর্ব প্রথম পুঁজিবাদের বিপদ সম্পর্কে চিল-চিৎকার শুরু করেছিলেন। জগৎবাসীকে সতর্ক করবার চেষ্টা করেছিলেন সে সম্পর্কে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁরা যাকে নিন্দা করেছেন, পরে তারই উপাসক হয়ে উঠেছেন। রাশিয়া এবং চিন ছাড়াও আমাদের রাজ্যের বিগত বামফ্রন্ট সরকার তার দৃষ্টান্ত। আসলে বামপন্থার এ তাবৎ ইতিহাস হল পুঁজিবাদের বুকে জন্মগ্রহণ করে পুঁজিবাদেই লীন হয়ে যাওয়া। এঁরা বাজারবাদের কিংবা বাজার সর্বস্বতাবাদের 'বিরোধিতা করেছিলেন যত ভালোমতো, তার বিকল্পটা কী তা ঠিক মতো নির্ধারণ করতে পারেননি। সেই জন্যে এঁরা লেনিন-স্ট্যালিনকে যত ভালো অনুধাবন করেছিলেন, আমাদের হাতের কাছেই থাকা রবীন্দ্রনাথকে ঠিকমতো ধরতেই পারেননি। এই শূন্যতাটা কখনও কখনও পূরণ করেছেন রবীন্দ্রভক্তির বৃথা বাগাড়ম্বর দিয়ে। তখন বোঝা না গেলেও শেষ পর্যন্ত তাঁদের চিন্তার দৈন্যই অপাবৃত হয়েছে

তাতে।

এঁদের দীনতার একটা দৃষ্টান্ত দিই। এঁরা আমাদের দেশে শ্রেণী-সংগ্রামের অব্যর্থ তত্ত্বের প্রয়োগে অবতীর্ণ হলেন। শাসনক্ষমতা হাতে পেয়েই গ্রামে গ্রামে লড়াই-লড়াই-লড়াই চালানোর শুধু বড় বড় জোতদারের বিরুদ্ধে নয়, প্রায় সব ভূমি-মালিকদের বিরুদ্ধেই। কিন্তু যারা 'আমাদের লোক' হয়ে গেল, তাদের ধনসম্পদে তুফান ডাকলো। জমিজমা বাড়তে লাগলো। কিন্তু অচিরে সমস্ত ভূমি-ব্যবস্থাটা একেবারে বেহাল হয়ে পড়লো। তার সব থেকে বড় প্রমাণ, রাজ্যটাকে ম্যাকিনসে প্রভৃতি কোম্পানির জমিদারিতে পরিণত করতেই চাওয়া। অর্থাৎ ভূমিহীনের ভোটের লোভে ছোট ছোট ভূমি মালিকানারও বিরোধিতা করলাম, আবার আরও বড় ভুমি-মালিকানার প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত হলাম। কিন্তু কীসের লোভে? ম্যাকিনসেরা যে উদ্যান-কৃষিতে বিপ্লব করতে পারেন, আমাদের দেশীয় মতে কি তা হতে পারে না? কৃষিটাকে এত পুঁজিনির্ভর করে তোলা কেন? পুঁজিবাদের বিরোধিতা করেও পুনশ্চ পুঁজির কোলেই ঢলে পড়া কেন? ব্যাপারটা কি সেই অসহায় শিশুর মতো মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে দ্বিগুণ বেগে মায়ের কোলেই ফিরে যাওয়ার মতো নয়?

আসল কারণ হল এঁরা যত সহজে না-টা বলতে পারেন, তত সহজে হাঁ-টা বলতে পারেন না। ঘৃণা (শ্রেণী বিশেষের প্রতি)-কে আশ্রয় করে না-টা বলে দেওয়া সহজ। কিন্তু বাজার সম্বন্ধের বাইরে বৃহত্তর 'মানব সম্বন্ধের ওপর স্থাপিত সমাজ উন্নয়নের সদর্থক এবং বাস্তবসম্মত কর্মপরিকল্পনা পেশ করতে গেলে আবহমান মানুষ ও মানব-সমাজকে জানা চাই তন্ন তন্ন করে কোনো তত্ত্বের ছাঁচে নয়। জুতোর মাপে পা নয়, পায়ের মাপে জুতো বানানো চাই যেমন, তেমনি যান্ত্রিক বাহ্যবিধির ওপর মাত্রাতিরিক্ত আস্থা ভ্রমাত্মক। মানুষের অন্তর শক্তির অসীম সম্ভাবনার দিকটিকে অনাবৃত করার কথাটাও সমান, কিংবা তার থেকেও বেশি জরুরি। এঁরা বাইরের ছাঁচটা থেকে বের হতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া সম্বন্ধে অপার মুগ্ধতা সত্ত্বেও তার ছাঁচ সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। রাশিয়ায় বিভিন্ন ভাষায় যখন 'রাশিয়ার চিঠি' অনুদিত হত, এসব অংশ বাদ দেওয়া হত। কিন্তু তাতে অনিবার্যকে ঠেকানো যায়নি। হয়তো যেত, রবীন্দ্রনাথের সতর্কীকরণকে প্রচারিত হবার সুযোগ দিলে!

সে যাক। মমতা যে শেষ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ প্রশ্নে সরকার থেকে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত যেতে পারলেন, তার মূলে নিশ্চয়ই কাজ করেছে মমতার নিজেরই মাটি-ঘেঁষা জীবন, তাঁর তৃণমূলপ্রীতি। কিন্তু এও অস্বীকার করা যাবে না যে শ্রদ্ধেয় বামপন্থার প্রত্যক্ষ না হলেও, পরোক্ষ একটি প্রভাবও পড়েছে মমতার এই সাহসী সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে।

আর বিপদাশঙ্কাটা সেই কারণেই। আগেই বলেছি, বামপন্থীরা এ তাবৎ 'না' বলতেই ওস্তাদি দেখিয়েছেন, কিন্তু 'হ্যাঁ' বলতে নয়। বিদেশি পুঁজিকে তো 'না' বলা গেল। কিন্তু পুঁজি কি লাগবে না? আসবে কোথা থেকে? ছোট ছোট কর্মোদ্যোগই বা শুরু হবে কী করে? স্বদেশি পুঁজির সর্বত্র চলাচলের কী হবে? শহরের পুঁজি গ্রামে খাটাতে পারে না কেন? গ্রামের পুঁজি গ্রামেই? বাধা কোথায়? অন্যতম বাধা প্রযুক্ত বামপন্থাই। সেই লড়াই-লড়াই এর সংস্কৃতি। যার জোরে দু'বিঘের বৃদ্ধার সঙ্গেও দিনমজুরের এখনও চলেছে এক অব্যক্ত শ্রেণীসংঘাত।

সেই রকম গর্জিত ঘোষণা না থাকলেও। এত বড়ো বিভ্রান্তি ও বিপর্যয়ের বৃত্তান্তটাকে, তার কার্যকরণ চক্রটাকে কি আমরা কিছুতেই দেখতে পাবো না?

কিন্তু এই যে ছোট ছোট অদৃশ্য পুঁজির অনন্ত শক্তির অবর্ণনীয় অবরোধ - তার মুক্তির পথ কী? এই তৃণমূলে পড়ে-থাকা পুঁজির প্রকৃত হিসেব কেউ করেছে কি কখনও? এত মাটি, এত জল, এত সূর্যালোক, এত হাত - মিলিয়ে দেখেছেন কি কত তার মূলধন-মূল্য? সাম্যের সংকল্প অথবা ভাঁওতা ছাড়াই কেবলমাত্র সমন্বয়ের শক্তিতেই যার অভূতপূর্ব অবরোধ মুক্তি ঘটতে পারে? 'সাম্য খুব ভালো। হয়তো, হয়ে যাক। কিন্তু যতদিন তা না হচ্ছে, সমন্বয়টা তো অন্তত হোক!' - বলেছিলেন শ্রদ্ধেয় পান্নালাল দাশগুপ্ত। তো, এই সমন্বয়সাধন করতে গেলে এক অন্যতর মানব সম্পদ লাগে। লাগে এক মূল্যবোধ। মূল্যবোধের সেই মূলধনমূল্যের প্রয়োগের জন্য চাই যোগ্য সাধক। হতে পারে সে-প্রয়োগ স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ এই তিন মেয়াদেই জড়িত।

এবং এও হতে পারে, আধুনিক দলতন্ত্র তার ভাষা জানে না, ভাবও জানে না। কিন্তু মমতা কি সেইরকমই একজন স্টিরিওটাইপ রাজনীতিবিদ যিনি অভ্যাসের অনুবর্তনেই ফুরিয়ে যান? উদঘাটনে ভীত? অথবা ঐতিহ্যের শক্তির পুনরাবর্তনে পরাঙমুখ? মনে হয় না।

তবে মমতা তাঁর স্বহস্তলিখিত চিঠিতে যে কথা দিয়েছিলেন পান্নাবাবুকে তা রাখতে দেরি করছেন কেন? মনে হয়, মমতা যে তুলনাহীন লড়াইয়ের মধ্যে ছিলেন কতকটা সে কারণে, কতকটা সমরে অপরিপক্কতার কারণে, কতকটা-বা জওহরলালীয় রাজনীতির পরিপার্শ্বের বেড়াজালে জড়িয়ে হয়তো তাঁর মনের কোণে থাকা বিকল্প ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীর চিন্তার গভীরতর শক্তিকে পরীক্ষা করতে পারেননি।

কিন্তু আজ সময় আগত। জোরালো 'না'-এর সঙ্গে মমতার মুখে ধ্বনিত হোক জোরালো 'হ্যাঁ' টিও। যার প্রভাবে ঘটতে থাকুক।

এক, গ্রামে গ্রামে মাটি, জল, সূর্যালোক ও অসংখ্য হাতের সর্বাত্মক সদব্যবহার। তা হয় কীসে, গৃহীত হোক তার একটি কর্মপরিকল্পনা।

দুই, স্বনিযুক্তির সর্ববৃহৎ ক্ষেত্রটি রচিত হতে পারে যে নতুনতর সবুজ আন্দোলনের দ্বারা, তার পন্থাপদ্ধতি নির্ধারণ ও বাধা অপসারণ করা হোক।

তিন, সকলের জন্য ছোট বড় মিলিয়ে দশটি করে গাছ এবং বছরের দশ কেজি করে মাছ কোথায় ও কেমন করে হতে পারে, তার পন্থাপদ্ধতি উদ্ভাবন করা হোক। তিনভাগের একভাগ খাদ্য হোক ফল - দরিদ্রতম মানুষটিরও। তাতে শুধু জ্বালানির খরচ কমবে না, দূষণ কমবে, স্বাস্থ্যোদ্ধারও হবে।

চার, শুধু রাসায়নিক সারে ভর্তুকি বাড়ানো নয়, উন্নততর প্রাকৃতিক চাষের প্রসারে অগ্রসর হওয়া, তার প্রকৃত বাধাটা কোথায় এবং তার দূরীকরণ কী করে সম্ভব, তা দেখা হোক।

পাঁচ, গ্রামের অর্থনীতি, দাঁড়াক বিক্রয় ও বিনিময়ের যৌথতায়। সম্প্রসারিত হয়ে যেতে পারে যা ক্রমশ গ্রাম ও

শহরের যৌথতায় এবং কাছের ও দূরের যৌথতায়। ছোট বর্তনীয় মধ্যে যথাসাধ্য সম্পূর্ণ হোক গ্রামীণ অর্থনীতি। তার উদ্বৃত্ত যাক বৃহত্তর বা বিশ্ববাজারে।

ছয়, বাংলার একশো দিনের কর্মসূচিকে ষোলআনা ঢেলে সাজানো হোক। শুধু চৌর্য ও প্রতারণায় পূর্ণ বলেই নয়। ওটা পারিবারিক চাষ, ছোট ছোট কর্মোদ্যাগগুলোকে তছনছ করে দিতেই উদ্ভাবিত, এই কথাটা বোঝা দরকার। ওই একশো দিনের টাকাতেই মানুষের তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের কাজ সৃষ্টি করা যায় কীভাবে, অগ্রসর হোক সে গবেষণাও। এবং বাংলার গ্রামে গ্রামে রচিত হোক এক নতুনতর মানববন্ধনী। স্বয়ম্ভর, সুস্থায়ী এবং সমৃদ্ধিময়ী। সারা ভারত উদ্বুদ্ধ হোক তাতে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, মক্তব-মন্দির-মাদ্রাসা-হাসপাতাল-সবই যুক্ত হোক তাতে।

মমতার প্রতি অনুরোধ, আমার এই সংক্ষিপ্ত ক'টি প্রস্তাবকে অনুগ্রহ করে একটু খতিয়ে দেখবেন যেন। বিষয়গুলি নিয়ে হাসাহাসি করবার মতো অতিবুদ্ধিমানের অভাব হবে না আপনার চার পাশে। কিন্তু সে সব অতিবুদ্ধির নিষ্ফলতাকে সবলে তিরস্কৃত করে আপনিই পারেন রক্তকরবীর নন্দিনীর মতো মা-মাটি-মানুষের অন্তরের বার্তা বহন করতে। শহরের রাজনীতি ও গ্রামের জীবননীতির মধ্যে মিলন ঘটাতে। রবীন্দ্রকাঙ্ক্ষিত আত্মীয় সমাজের প্রতিষ্ঠা ঘটাতে, যা একই সঙ্গে হবে গ্রামের এবং বিশ্বের। কমার্স ও বার্টারের। প্রীতির এবং বৈরাগ্যের।

অতি দলীয়তার মাধ্যমে রাজ্যে গড়ে উঠেছে এক অসমীচীন সমাজ

না অর্ডার দিয়ে পাওয়ার জিনিস নয় এই নবজাগরণ। নবজাগরণ হল সেই বিরল বর্তমানতা, অতীত ও ভবিষৎ যেখানে স্থান করে নেয় নির্বিরোধে, দুঃখ পরিণত হয়ে যায় মহান বিত্তে, সংকট সম্পদে। এক কূলপ্লাবী আশায় জেগে ওঠে মন। বুদ্ধি ও বোধিও হয় তাঁর সহযোগী। ষোড়শ ও উনিশ শতকের জাগরণ, যতই হোক আংশিক, এই পথেই জেগে উঠেছিল। হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যে জেগে উঠেছিল সমুচ্চ দুই চূড়া - বৈষ্ণবসাহিত্য ও রবীন্দ্রসাহিত্য। যেখানে অতীতের সম্পদ হয়েছিল সঞ্চিত, ভবিষ্যৎ পেয়েছিল আশ্রয়েরই আশ্বাস। অতীতের যা কিছু মরণীয় তার অনেকখানি গিয়েছিল মরেই, ধ্যানমূর্তি ধরে জেগে উঠেছিল, যা কিছু ছিল অবিস্মরণীয়।

দুটি নবজাগরণই ঘটেছিল দীর্ঘ অবসাদ যুগ পেরিয়েই। শ্বাসরোধী শূন্যতার অবসানেই। এই যুগে বাঙালির শূন্যতার পর্ব শুরু হয়েছিল কবে? বিশেষ করে '৪৭-এর বঙ্গভঙ্গের পর থেকেই নয় কি? স্বাধীনতা হয়তো আশার একটি সংবাদী সুর শোনাতে চেয়েছিল বাঙালিকে। কিন্তু বাঙালি হৃদয় কি তেমন করে জেগে উঠেছিল তার ফলে? ১৮৫০ থেকে ১৯০৯ এবং ১৯৫০ থেকে ২০০৯- এই দুই কালপর্বের সাহিত্যের তুলনা করলেই ফুটে ওঠে না কি এই পর্বের বাঙালির অবসন্ন হৃদয়ের আর্তি? আগের পর্বের সঙ্গে উচ্চতায় এই পর্বের বাঙালি পাশে দাঁড়াতে পারবে কি?

ইতিহাস ঘাঁটতে হবে না - ঠিক এই পর্বে আমরা দাঁড়িয়ে আছি কোথায়? লালগড়, গোর্খাল্যান্ড, কমতাপুরি আন্দোলন আজ কী বলে? গ্রামে গ্রামে খুব-গরিব আর কম-গরিবের মধ্যে চলমান 'শ্রেণীসংগ্রামের' ফলে গ্রামগুলো কি শোচনীয়ভাবে শ্রীহারা, সম্পদহারা হয়ে গেল না? আজ সেগুলি ত্যাজ্যভূমিতে পরিণত হয়ে গেল নাকি? পড়ে আছে কোম্পানিদের অধিগ্রহণের আশায়? মাইলের পর মাইল জনবিল, আর শহরগুলি এমন জনভারাক্রান্ত হয়ে উঠল কেন? সমগ্র দেহের রক্ত মুখেই কেন? এই ভারসাম্যহীনতার কারণ কী? নিচে শ্রেণীসংগ্রাম আছে, কিন্তু ওপরে নেই কেন? ওপরে - অর্থাৎ মন্ত্রী, আমলা, কোম্পানিতে হাত মিল করে চলা যদি 'ঐতিহাসিক বাস্তবতা' হয় তাহলে, নিচেয়, গ্রামে গ্রামে, প্রাগৈতিহাসিক বাস্তবতা বিরাজ করছে কেন?

শুধু অসম জনঘনত্বের সমস্যা নয়, ধারাবাহিক ঘটনাপুঞ্জ অতি-দলীয়তার হাত ধরে অসমীচীন এক সমাজ-প্রযুক্তির প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ককে অধিকতর হারে পুঁজিনির্ভর করে তুলেছে, অন্য সম্পর্কের স্মৃতিটুকুকেও যা বিলুপ্ত করে দিতে চায় আপন বিস্তারের স্বার্থে, দল পুঁজির সখ্যের স্বার্থে। ওপরে মিল আর নিচে বিরোধ রহস্যের চাবি আছে এখানেই।

এই সমাজ-প্রযুক্তি ব্যবসায়িক সমাজ-প্রযুক্তি পুঁজিপ্রধান সমাজ-প্রযুক্তি। এই সমাজ প্রযুক্তি মানুষের বিচিত্র সেবায় আবির্ভূত হয়েও মানুষেরই তিন অনন্য আশ্রয়কে আজ বিধ্বস্ত করতে উদ্যত হয়েছে। সে হল প্রকৃতি, পরিবার ও সমাজ। এখানে সমাজ মানে ঐতিহ্যাশ্রিত সমাজ, আত্মীয় সমাজ। পুঁজিপ্রধান সমাজের বিরুদ্ধে বহুদিন যাবৎ গুরুতর অভিযোগটি ছিল নীতিঘটিত। অসাম্যকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে বলে। কিন্তু আজ

মাত্র আড়াইশো বছরের যাত্রাপথের শেষে সে পৃথিবী থেকে প্রাণ বিলোপের মতো আরও বড় ভয়াল ও বীভৎস অভিযোগে অভিযুক্ত। এই সমাজ পৃথিবীকে দুটো বিশ্বযুদ্ধ উপহার দিয়েছে, দেশে দেশে অন্তরে বাইরে সূচিত করেছে এক বিধ্বংসী বিস্তারবাদের। তারই ফলে সব দেশে দেশে সঞ্চিত করে চলেছে আরও আরও সমরোপকরণ। সব মিলিয়ে আগামী ৫০/১০০ বছরেই পৃথিবীর সমস্যাকে আয়ত্তের অতীত জায়গায় নিয়ে যাওয়ার সব আয়োজনই যেন সম্পূর্ণ।

এই সমাজই তার শক্তি প্রতিষ্ঠিত করেছে নগরে। হাতে নিয়েছে রাষ্ট্রশক্তি। কখনও বহুজাতিকেরা মিলে, সে রাষ্ট্র শক্তিকেও পরিণত করে পুতুলে। সে আজ জগজ্জয়ী। বৃথা বিষেদাগারে তার শক্তিকে কাবু করা যাবে না কিছুতেই। যাবে না বলেই খোঁজা উচিত অন্য পথ।

তার মানে এই নয়, নগরকেন্দ্রে পুঁজি-আশ্রয়ী যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার কোনও সংশোধন সংস্কার একেবারেই অসম্ভব বা অকর্তব্য। প্রশাসন ও পরিষেবার নানা কেন্দ্রায়িত ক্ষেত্রে, সংশোধন-সংস্কার কিছু সুফল এনে দিতেই পারে। সে চেষ্টা বহাল রেখেও অন্য পথও খোঁজা দরকার যেখানে আবহমান সমাজের - শক্তি, সম্পদ সৃষ্টি ও তার বন্টনে একটি ভূমিকা পালন করতে পারে। এক কথায়, দু'ধরনের সমাজ পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলতে পারে কি না তারই পরীক্ষা। বিগত হাজার হাজার বছর ধরেই প্রধান হয়ে ছিল আত্মীয় সমাজেরই বৈশিষ্ট্য। হাজার হাজার বছর ধরে টিকে থাকবার শক্তি তার থাকলেও, কোথাও হয়তো ছিল তার সীমাবদ্ধতা। আজ যখন পুঁজি-আশ্রয়ী ব্যবসায়িক সমাজের দিকে তাকাই, তখন তার শক্তির বিপুলতা ও দুর্বলতা দুই-ই চোখে পড়ে। একদিকে চোখধাঁধানো প্রবল উজ্জ্বলতা, আর এক দিকে দ্রুত বিলুপ্তির করুণ অসহায়তা। বোঝাই যাচ্ছে, সে দারুণ দাপুটে। আত্মীয় সমাজের অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করার শক্তি রাখে সে। কিন্তু বড় করুণভাবে স্পষ্ট হল আজ, সে ছিল দু'দিনের বাদশা।

তাই আমাদের প্রস্তাব হল তৃতীয় সহস্রাব্দের প্রথম কয়েকটি দশক ধরে কি আমরা দুই প্রকৃতির সমাজের যৌথ ভূমিকার সম্ভাবনাটি পরীক্ষা করে দেখতে পারি না? - আমাদের 'এই সূর্যোদয়ের দিগন্তে? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের নতুন এক পরীক্ষাও হয়ে উঠতে পারে যা? যে- পরীক্ষায় গ্রাম ও শহরের মধেও গড়ে উঠতে পারে - উগ্র আগ্রাসিকতা নয় - সহযোগিতারই সম্পর্ক? যার দ্বারা কলকাতা এতখানি কলকাতা হয়ে উঠবে না, লালগড় এতখানি লালগড় থাকবে না?

কিন্তু এই পরীক্ষাও কম কঠিন হবে না। প্রথমত, অনভ্যাসের কারণ। অভ্যাসের দ্বারাই তা সহজ হয়ে আসবে হয়তো। কারণ, খুনোখুনির মতো কদর্য জিনিসটাও এমনিতে কম কঠিন ছিল না। অভ্যাসের ফলেই আজ তা এত সহজ। তাহলে, যাকে ঘিরে আছে এত স্বপ্ন, এত সম্ভাবনা - তার পৃথক অভ্যাস রপ্ত করতে পারবো না কেন? দ্বিতীয়ত, ভুল বা কু-অভ্যাসের পিছুটান। প্রোডাকশন বাই দ্য মাসেস নয়, মাস প্রোডাকশনের কু-অভ্যাস। কিন্তু ও পথের বিশ্বজোড়া মহা সুনামি যখন পৃথিবীটাকেই আজ পথে বসাতে চায়, তখন উৎপাদনের ওই দানবীয় পদ্ধতির প্রতি মানুষের বীতরাগ ক্রমশই উপজাত হবে এবং মানুষ অচিরেই উন্মুখ হবে নতুন

পথেরই সন্ধানে, মানব-সম্পর্কের পুনর্জাগরণে তা হয়তো সহজেই বলা যায়।

কোনও সরকার এইরকম একটি উদ্যোগের শরিক হতে দ্বিধান্বিত হতেই পারে। নতুন খরচা চাপবে — এমন আশঙ্কার কারণে নয়। সরকারের খরচ এ পদ্ধতিতে বহুলাংশেই লঘু হয়ে যাবে। কিন্তু প্রচলিত ব্যবস্থায় দাতা-গ্রহীতার অভ্যস্ত সম্পর্কের অধিকারবোধ যাবে অনেকটা অবলুপ্ত হয়ে। যে সরকার প্রেমে প্রসন্ন নয় পরন্তু আগ্রাসী অধিকারবোধে উগ্র, সেই সরকারই সমাজকে নিষ্ক্রিয় রেখে নিজে হয়ে ওঠে অতি-তৎপর। এই তৎপরতা, বলা বাহুল্য করে দেওয়ার জন্য তত নয়, করে নেওয়ার জন্য যত। এই পথের প্রান্তে এসে নিষ্ক্রিয় সমাজ যখন সক্রিয় হয়ে ওঠে, তখনই প্রতারিত, আত্মহত্যা-উন্মুখ হবু প্রাথমিক শিক্ষকদের মুখের গ্রাস এক আকস্মিক ঐন্দ্রজালিক কায়দায় রূপান্তরিত হয়ে যায় লালগড়বাসীদের জন্য গোলা-বারুদে। সেইজন্য, মনে হয়, সেই সরকারই ভালো সরকার যে নিজেকে অপেক্ষকৃত গোপন রেখে সমাজ ও সমাজ মধ্যবর্তী ব্যক্তিকেই সক্রিয় করে তোলে বেশি। গ্রামীণ বা আত্মীয় সমাজে সহযোগিতা ও সম্প্রীতিমূলক কৃষি ও কৃষিশিল্পের আদিগন্ত ছড়ানো সম্ভাবনাকে উদঘাটন করতে যে উদ্যোগী হয় আন্তরিকভাবে।

পারিবারিক কৃষির সুরক্ষায় সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে প্রয়োজন স্বয়ংক্রিয় সমাজ আন্দোলন

কৃষির সংকট মোচনের অন্যতম পদক্ষেপ হওয়া উচিত কৃষির সমৃদ্ধিসাধন। বিগত একাধিক দশক জুড়ে উৎপাদনের ব্যয়বৃদ্ধি ও আয়ের ক্রমহ্রাসমানতা - এই দ্বিমুখী সমস্যা যাতে গভীরতর সংকট তৈরি না করে তার জন্য একাধিক বৃহদাকার ব্যবস্থা সরকারের তরফে নেওয়া উচিত বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু তার পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তাও অত্যন্ত প্রসঙ্গিক বলেই পরিগণিত হওয়া উচিত। প্রাকৃতিক চাষ ও তার সহযোগী সমাজ সংগঠনটির উদ্ভাবন, পরীক্ষা, প্রতিষ্ঠা এবং ক্রমিক প্রসারই হতে পারে প্রত্যাশিত সেই সামাজিক উদ্যোগ। এই উদ্যোগকে অগ্রসর করে নিতে অতিরিক্ত কোনও অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন হবে না। প্রচলিত প্রকল্পসমূহের কিঞ্চিৎ পুনর্গঠন পথেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এক প্রাগ্রসর কৃষিনীতি।

সেটাই হয়ে উঠতে পারে সমগ্র ভারতের কাছেই বাংলার এক অনন্য উপহার। কৃষিসংকটের পাশাপাশি পরিবেশ, সমাজ তথা আর্থিক বৈষম্যজনিত সমস্যার সমাধানের পথটিও প্রশস্ত হবে তাতে - এই আমাদের বিশ্বাস। এই সামাজিক উদ্যোগের দ্বারা। কৃষিক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক বেকারের স্বনিযুক্তির একটি অভিনব ক্ষেত্রও খুলে যেতে পারে। এই উদ্যোগটির নাম দেওয়া যেতে পারে স্বয়ংক্রিয় সবুজ আন্দোলন। ইংরেজিতে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে /// । এই আন্দোলনও স্বয়ম্ভর, কিন্তু স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সীমাবদ্ধতা দূর করতেই পরিকল্পিত। এর লক্ষ্য গ্রামকে যথাসাধ্য স্বয়ম্ভর করে তুলে গ্রাম ও শহরের প্রকৃত পরস্পর-নির্ভরতার সম্পর্কটিকে পুনরুদ্ধার করা। এবং তা করতে হলে, সমাজ-মধ্যবর্তী সকল মানুষের মধ্যে একটা বিনিময়যোগ্য মূলধনরূপে প্রতিষ্ঠা করা চাই সম্পর্কের সৌন্দর্যরূপকে। সম্প্রীতির শক্তিরূপকে। শুধু সরকারি প্রকল্প বিশেষের পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠনের দ্বারা বেশি দূর অগ্রসর হওয়া যাবে না।

দূরের কথাটাকে আগে থেকেই খেয়াল না রাখলে কাছের কাজগুলিতেও পদে পদে বিঘ্ন উপস্থিত হতে পারে। সেগুলি প্রথমেই স্মরণে রেখে প্রাথমিক কার্যকরী পদক্ষেপগুলি কী কী হতে পারে, তার খুটিনাটিগুলো বলা যেতে পারে -

এক, এই আন্দোলনে ক্ষেত্রসীমা হবে যথাসাধ্য মাঝারি মাপের। কমবেশি৫০০ থেকে ১০০০ জন মানুষকে নিয়ে, যাঁরা কৃষিজমির সঙ্গে কোনও না কোনও সূত্রে যুক্ত।

দুই, উক্ত সংখ্যার মানুরা সংগঠিত হবেন ত্রিস্তরীয় ভাবে। মালিকপক্ষ মজুরপক্ষ এবং দুইপক্ষকে মিলিয়ে, দুইপক্ষেরই লাভ বাড়িয়ে, নিজেদের স্বনিযুক্তির ব্যবস্থা করবে যে মধ্যবর্তী মঞ্চ।

তিন, এই মধ্যবর্তী মঞ্চ কেবলমাত্র অব্যবহৃত এবং অল্পব্যবহৃত ক্ষেত্রেই গাছ লাগানো ও মাছ চাষের ব্যবস্থা করবে। রাস্তা খাল বিল নদীনালা প্রভৃতির ধারে ছাড়াও জমির একটি আলের ধারের অংশেও কম ছায়ার প্রধানত ফলের গাছ লাগাবে ও ধানের জমিতে মাছ চাষের ব্যবস্থা করবে।

চার, এইসব চাষের ফসলের তিনটি ভাগের একটি ভাগ গ্রহণ করবে এই মধ্যবর্তী মঞ্চ। অন্য দু-ভাগ নেবে মালিক ও মজুরপক্ষ। মালিক ব্যাক্তিও হতে পারে, সরকারও হতে পারে। মজুর বলতে তাদেরই বোঝাতে,

মাসে ২/৪ দিনই কেবল যুক্ত হবেন যাঁরা সবুজ সুরক্ষায়। এইভাবে দীনতম দিন মজুরেরও জনপ্রতি ক্রমশ দশ কেজি করে মাছ ও দশটি করে গাছ (ছোট বড় মিলিয়ে) পাওনা হতে পারে প্রস্তাবিত গ্রামে।

পাঁচ, এই মঞ্চের অন্যতম কাজ হবে অল্প ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত ক্ষেত্রের বাইরে যে পারিবারিক চাষ আছে তার সর্বাত্মক সুরক্ষার দায়িত্ব নেওয়া। সেই সূত্রে একটা ন্যুনতম আয় করে নেওয়া। মঞ্চ কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই আংশিকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে যেমন উৎপন্নের প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনে।

ছয়, প্রাকৃতিক সার ও কীটনাশকের সরবরাহের দায়িত্ব নেবে মঞ্চ। বাংলার অধিকাংশ ক্ষুদ্র চাষির পক্ষেই নয় শুধু, কারও পক্ষেই আজ আর সহজ হবে না স্বল্পব্যায়ের প্রাকৃতিক চাষের ব্যবস্থা করা। রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের জন্য চাষির যে ব্যয় হয় উদ্দিষ্ট মঞ্চ তার দশ ভাগের এক ভাগ মূল্য নিয়েই কৃষিক্ষেত্রে নতুন করে স্বনিযুক্ত করতে পারে হাজারজন মানুষের মধ্যে ১৫ থেকে ৫০ জন মানুষকে। করতে পারে, জমির মালিক ও মজুরের যথেষ্ট আয়বৃদ্ধির আনন্দজনক শর্তেই।

সাত, মঞ্চ তার কাজের পরিমাণ ও বৈচিত্রবৃদ্ধির পূর্বেই কয়েকটি উপসমিতি তৈরী করে কাজ শুরু করতে পারে। যেমন - ক) পশুখাদ্য উপসমিতি খ) সুরক্ষা উপসমিতি গ) পক্রিয়াকরণ উপসমিতি এবং ঘ) বিপণন উপসমিতি। গরু-ছাগলের উৎপাত নিবারণের পূর্বেই পশুখাদ্য উৎপাদনের সুব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলেই গণ্য হবে।

আট, বিচিত্র চাষের পুনরাবর্তনের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রকে কিঞ্চিৎ পুনর্গঠনের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও এই আন্দোলনের অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। মঞ্চের ব্যবস্থাপনায় সুরক্ষার জন্য ব্যয়ের হ্রাস ঘটলে, একশো বিঘা জমির মধ্যে নিচুতর ৫/৭ বিঘা জমিকে জলাধারে পরিণত করে জলকৃষি-সহ বিচিত্র কৃষির এক বিপুল সম্ভাবনা দেখা দেওয়ার সঙ্গে পরিবেশ - সমস্যার সমাধানেরও এক নতুন রাজপথ আবিষ্কৃত হতে পারে।

নয়, মঞ্চ কর্তৃক সুরক্ষা-প্রাপ্ত জলাধারে মাছ চাষ করে ও তার জল বিক্রিও বিশেষ করে, বিনিময় করে চাষি প্রভূত আয় করতে পারে।

দশ, নতুন সবুজ আন্দোলনের এই পরীক্ষায় কৃষিমন্ত্রকের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে উদ্যান-কৃষি, পরিবেশ, জৈবপ্রযুক্তি, গ্রামোন্নয়ন ও শিক্ষা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকগুলি। শিক্ষামন্ত্রক ইতিমধ্যেই যুক্ত হয়েছে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। কেন্দ্রের রেল মন্ত্রককেও যুক্ত করা যেতে পারে এই ব্যাপারে, যার খুঁটিনাটি আলাদাভাবে আলোচ্য।

প্রাকৃতিক চাষে লাভ হতে পারে অবিশ্বাস্য রকমের, যদি রকমারি ফসলের চাষকে ফিরিয়ে আনা যায়, তাকে আরও বিচিত্র ও বর্ধিত করা যায়। স্বল্পব্যয়ের কৃষিপ্রযুক্তি ও স্বল্পব্যয়ের সমাজ প্রযুক্তির সমন্বয়ই নতুন এই সবুজ আন্দোলনের মূল শক্তিকেন্দ্র।

প্রাকৃতিক চাষের প্রযুক্তি প্রসারের সঙ্গে তার উপযোগী এক সমাজপ্রযুক্তি তথা সমাজ সংগঠনতন্ত্রের

মধ্যস্থতা বাংলার গ্রামকে, তার কৃষিকে আসন্ন সামূহিক বিপর্যয় থেকে আরও ভালোভাবে রক্ষা করবে - এই বিশ্বাসেই আমাদের এই পরীক্ষামূলক কর্মপরিকল্পনার প্রস্তাব। সামাজিক আন্দোলনের প্রস্তাবের সঙ্গে পারিবারিক চাষের সুরক্ষাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কেন, তা যথাযথভাবে অনুধাবন করা চাই। তারও আগে বুঝে নেওয়া চাই পারিবারিক চাষ কাকে বলে? বলা ভালো, আজকের বাস্তবতায় কাকে বলা উচিত। একথা ঠিকই, পুঁজি লাগে না যে চাষে এবং চাষি নিজে হাতেই যে চাষ সম্পাদন করে, তাকেই পারিবারিক চাষ বলা হয়েছে এত কাল। ফ্যামিলি ফার্মিং শব্দটা দাঁড়িয়েছিল ক্যাপিটাল ফার্মিং-এর বিপরীত বাস্তবতা হিসেবে। ফিউডাল ফার্মিং বা কো-অপারেটিভ ফামিং-এর বিপরীত নয়। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, পুঁজি প্রয়োগের বাহুল্য ঘটেছে আজ সব রকমের চাষেই। সেই জন্যে বিশুদ্ধ পুঁজি বিযুক্ত চাষ বলেও আজ আর কিছু নেই। সেই দিক থেকে সংকুচিত অর্থে পারিবারিক চাষ বলেও কিছু নেই। শুধু তাই নয়, পুঁজির ব্যবহার আজ এতটাই বেড়ে গেছে যে পরিবারের হাতে কৃষিকে ধরে রাখাটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে সভ্যতার অন্যতম বড় সংকট। এক নজরে সকলের চোখে এটা পড়েই না যে, পারিবারিক কৃষির ধ্বংসের সঙ্গে সভ্যতার অকল্পনীয় সংকটের যোগটা কোথায় এবং কেমন।

এটা আমরা অনেকেই বুঝতে পারি যে, সভ্যতার সূচনা ও সংরক্ষণে পরিবারের ভূমিকা কোনও তুলনাই নেই। পরিবারের সূচনা হয়েছিল আবার কৃষিকে ঘিরেই। সেই সূত্রেই কৃষির সঙ্গে সভ্যতার যোগ নিবিড়। সত্য বটে, একথা স্বীকার করতে হবে যে, পরিবারের সৃষ্টির উচ্চতর উদ্দেশ্য অসিদ্ধ রয়ে গেছে শোচনীয় ভাবেই। যা ছিল রাস্তা তা হয়ে উঠেছে ঘর -বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' নামক প্রবন্ধে।

আগামী কয়েক দশকে আরও বিপুল পরিমাণ জমি কৃষিসীমার বাইরে চলে গেলেও জনসংখ্যা আরও দুশো কোটি বাড়লেও অনুমান করা যায়, পৃথিবী তবুও বিপন্ন হবে না খাদ্যাভাবে। বরং হবে, খাদ্যের তথা সম্পদের বন্টন বিভ্রাটে, তার ক্রমপুঞ্জীভবনের পাপে। পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদনের পরিকল্পনাতেই চুক্তি চাষের প্রয়াস ও প্রসার চলেছে দিকে দিকে। এই প্রয়াস এমনই আগ্রাসী যে তা শুধু নিজের শক্তি প্রদর্শনেই সন্তুষ্ট নয়, ছোট ছোট জোতদার বর্গাদার-দিন মজুরের যৌথতায় টিম টিম করে চলছে সম্প্রসারিত অর্থের যে পারিবারিক কৃষি, তাকে গোড়া ঘেঁষে ব্যর্থ করে তোলার যন্ত্রও চলেছে পাশাপাশি। লক্ষ, মানবজাতিকে খাদ্যাভাসের সংকট থেকে উদ্ধার করা।

কিন্তু ভারতের যে আশি কোটি মানুষের দিন চলে মাত্র কুড়ি টাকায়, তারা সেই খাদ্য খরিদ করবে কী করে? আগ্রাসী কর্পোরেট কৃষির কবলে পড়ে ৬০ শতাংশ স্বনিযুক্ত কৃষি শ্রমিকের বারো আনাই পুনশ্চ বেকার হয়ে পড়বে না কি? তাহলে ওই আশি কোটি অতি গরিবের দলে যোগ দেবে আরও কত কোটি? তাদের সরকার খাওয়াবে? কর্পোরেট বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া নজরানার টাকায়? সমগ্র ইউরোপ আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়ার মোট মিলিত জনসংখ্যার সমপরিমাণ মানুষকে ওই নজরানার নঙ্গরখানা খুলে খাওয়ানো কি সম্ভব?

ভারতের একশো জন ধনী মানুষের হাতে আজ জমা হয়েছে দেশের প্রায় সিকি পরিমাণ সম্পদ। আরও সিকি পরিমাণ সম্পদ তাদের হাতে পুঞ্জীভূত হওয়ার আশঙ্কায়। আসলে আমাদের একথা বুঝতেই হবে

যে, ভারতের জন্য চাই আলাদা পথ আলাদা পরীক্ষা। শুধু ভারতের প্রকৃতি, তার ইতিহাস, তার বাস্তব পরিস্থিতি আমাদের এমন ভাবনায় প্ররোচিত করে না। সমগ্র পৃথিবীর পরিবেশ, অর্থনীতি, সামাজিক ও আত্মিক সংকটের সামগ্রিক বিচারও আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে নতুন পথের সন্ধানে।

নতুন পথ? বোধ হয় নয়। চিরকালের পথকেই একটু নতুনরূপে সাজিয়ে নেওয়া, সঞ্জীবিত করা। কৃষিক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক কর্পোরেট কৃষির প্রতিক্রিয়াতেই আমাদের খুঁজতে হচ্ছে সম্প্রসারিত অর্থের সহযোগিতামূলক পারিবারিক কৃষির সম্ভাবনার উদঘাটনের পথ। সেই পারিবারিক কৃষির প্রধান লক্ষ্য কী হবে? সুরক্ষার এক সামাজিক রাস্তা আবিষ্কৃত হতে পারে আজ সারা দেশ জুড়ে। শুধুমাত্র অব্যবহৃত ও অল্প ব্যবহৃত বিস্তৃত অঞ্চলে এবং কৃষি ক্ষেত্রে উদ্যান কৃষির আংশিক সংযোজনের দ্বারাই। স্বনিযুক্তির সহযোগে। বহুমুখী উদ্দেশ্যসাধক প্রস্তাবিত এই আন্দোলনের প্রধান শক্তি অর্থ বিনিময়ের সঙ্গে বিনিময়কেও গ্রামীণ অর্থনীতির ভরকেন্দ্রে স্থাপন করা। জমির মালিক ও জমির মজদুরের বাড়তি কিছু ব্যয় না করেই বাড়তি কিছু আয় করা এবং মধ্যবর্তী মঞ্চের কিছু দেওয়ার সুযোগ লাভ করে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সক্ষমতা লাভ করা।

কিন্তু এই আন্দোলনের প্রধান শত্রু দলতন্ত্র। আমাদের এই প্রস্তাবকে পূর্ববর্তী বাম সরকার অস্পৃশ্য করে রেখেছিল, দলবাদকে তারা আদিম গোঁড়া গোষ্ঠীবাদে রূপান্তরিত করেছিল বলেই। তার সঙ্গে মিলে ছিল শ্রেণী সংঘর্ষের বঙ্গীয় বিধি। সেখানে জেগেছিল ঘৃণা ও না-এর রাজনীতি, যার জন্যে দু'বিঘের বৃদ্ধার সঙ্গে দিন মজুরের লেগেছিল এক হিংসাদীর্ণ - কখনও গোপন কখনও প্রকাশ্যে লড়াই লড়াই। আর্থিক অবস্থানের নিচের স্তরে সদম্ভে বিরাজ করছে যখন এই প্রাগৈতিহাসিক বাস্তবতা, ওপরের স্তরে তখনই এসে গেল কর্পোরেটকুলের সঙ্গে সখ্যের 'ঐতিহাসিক বাস্তবতা'। এই দুই বাস্তবতার দ্বন্দ্বে বাংলা যখন বেপথুমান, তখন আর যাই হোক সমাজ সংহতির শক্তি ও সম্ভাবনাকে পরীক্ষা করবার সময় নয় সেটা।

নতুন সরকার এসেছে আজ। দলতন্ত্রের ওপরে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিতেই ঘটেছে তার আবির্ভাব। ওপরের স্তরে ছোটখাটো ব্যতয়-বিচ্যুতি হয়তো সহজেই অতিক্রম করা যাবে। কিন্তু নিচের স্তরে একেবারে কৃষিক্ষেত্রে, গণতন্ত্র তথা সামাজিকতা তথা পারিবারিকতার শক্তি ও সম্ভাবনা নিয়ে তাঁরা কি ভাবছেন, জানি না। আমলা-নির্ভর, অর্থ-অপচয়ী, প্রকল্প পরিকল্পনার দৌড় যে খুব বেশি হয় না সেটা দেখে এবং ঠেকেও অবোধ্য থেকে যাবে, তা মনে করি না।

মনে রাখতে হবে, বাম দলগুলি যখন ঘৃণ্য ও না-এর জনপ্রিয় রাজনীতি শুরু করেছিল তখন সম্মুখে যে ভূমিমালিকরা ছিল, ভয়ঙ্করতায় তারা ক্ষেপা কুকুরের বেশি ছিল না। তাদের মেরে ফেলে দ্বারে আজ উদিত হয়েছে দৃপ্ত সিংহকুল। নতুন সরকারকে ভাবতে হবে, এদের কীভাবে প্রতিহত করা হবে অথবা 'আব্দুল মাঝি'র মতো অনুগতই বা করা যাবে কোথায় কতখানি। সে ভাবনা চালাতে চালাতেও সবুজ আন্দোলনে। যা সম্পর্ক ও সম্প্রীতির বিশ্বরূপ দর্শনের প্রতিশ্রুতিবাহী এবং যেখানে দলের স্বার্থের আপাত ক্ষুণ্ণতাই দেশের এবং দলেরও আখেরে লাভ ঘটাতে পারে প্রভূত পরিমাণে।

রাজ্যের সারস্বত প্রতিষ্ঠানগুলিকে দলতন্ত্রের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করা প্রয়োজন

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর অঙ্গনে সম্প্রতি যা ঘটে চলেছে, তা গভীর মনোযোগ দাবি করে। সাহিত্য পরিষদ বাংলার নবজাগরণের অন্যতম স্মারক পীঠ হিসেবেই গণ্য। বিগত বাম সরকারের আমলে যখন দলের থেকে উঁচু করবার কথা ছিল না কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে, তখন স্বাভাবিকভাবেই বাঙালির উঁচু উঁচু প্রতিষ্ঠানগুলিও সব কুব্জ এবং খঞ্জ হতে থাকে ক্রমান্বয়ে। একটা উপরিতলগত রাজনৈতিক পরিবর্তন ইতিমধ্যে ঘটে গেছে। বদলার পরিবর্তে বদলের এবং দলতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়েছে মাত্র। গভীর সংস্কৃতিগত পরিবর্তনের জন্য সময় দেওয়া উচিত যখন, সহযোগিতার হাতও বাড়িয়ে দেওয়া উচিত, তখন কি ঘটছে চারিদিকে?

সত্য বটে, জোঁদা (যমদুতিকা?) দলতন্ত্রের প্রতিক্রিয়ায় শুদ্ধ গণতন্ত্রকে লাভ করা খুব সহজসাধ্য কাজ নয়। তবু সম্প্রতি-সমাপ্ত ভেটের পরে দুই তরফেই একটা চেষ্টা জেগে উঠেছিল সহযোগিতার দলীয়ভাবে নির্বাচিত উচ্চ উচ্চ পদাধিকারীরা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলেন নতুন যুগকে জায়গা দেওয়ার সদিচ্ছায়। অন্য তরফেও কিছু কিছু উদারতা দেখা গেল পুরাতন পদাধিকারীদের প্রতি। কিন্তু অচিরেই দেখা গেল পুরনো পদাধিকারীদের এক ধরনের প্রতিরোধী মনোভাব। কাজে নিরন্তর দীর্ঘসূত্রিতা ও বিঘ্ন সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে যার প্রকাশ। যদিও 'কৃপাপ্রাপ্ত' পদাধিকারীদের করবার ক্ষমতাই ছিল সীমিত। অন্ধ যান্ত্রিক পুনরাবর্তনের বাইরে স্বাধীন চিন্তা নিয়ে কিছু করবার মতো কল্পনা-শক্তি এঁদের আয়ত্তাধীন নয়।

নতুন সরকারের বয়স এক বছর হতে না হতেই এই সব পুরাতন কৃপাজীবীরা নতুন আশায় বুক বেঁধে সহসা যেন বেশ অনেকটা আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ। পুরনো মার্কসবাদীরা যেমন স্বপ্ন দেখেছিলেন রাশিয়ার অনুকরণে এদেশেও বিপ্লব হল বলে, ইতিহাসের আবর্জনা স্তূপে নিক্ষিপ্ত সিপিএমও তেমনি ভাবতে শুরু করেছে পাঁচ বছর উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই মমতা সরকারের পতন হচ্ছে। এই আশায় বুক বেঁধে কেউ কেউ দুঃসাহসিকও হয়ে উঠেছেন, তাঁরা কোনও কথা বলবেন না। এমন নয়, অবশ্যই বলবেন। কিন্তু অকথা বলবেন কেন! যুক্তি ও তথ্য পড়ে থাকবে এক দিকে, আর তাঁদের কথা চলে যাবে আর এক দিকে? সাহিত্য পরিষদ-এর ঘটনাধারার মধ্যেও এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সে সব কথায় যাবার আগে কিছু প্রাসঙ্গিক কথা সেরে নিই।

আকস্মিক এই আগ্রাসিতার কিছু কারণ নিশ্চয়ই আছে। প্রথম কারণ হচ্ছে, সাম্প্রতিক ব্রিগেডের সভায় প্রত্যাশামতো জন সমাগম। দুই, তৃণমূল দলে নব্য তৃণমূলীদের দৌরাত্ম। তিন, স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু অসতর্ক উক্তি। কিন্তু তিনটি ব্যাপার সিপিএমকে ফিরিয়ে আনতে বাঙালিকে যে উদ্বুদ্ধ করবে, এঁরা সেটা ধরে নিলেন কোন যুক্তিতে? আমাদের মনে রাখা দরকার, স্বপ্ন দেখবার ক্ষমতা খুবই উন্নত মানের জিনিস হয়, যখন তার পিছনে থাকে যুক্তির জোরাল সমর্থন।

এই তিন রকমের ঘটনার ওপরে অতিপাত করা যাক আরও কিছু সময়। এক, ব্রিগেড-সমাবেশের আপেক্ষিক সাফল্য। জরুরি অবস্থার সময় ইন্দিরার সভায় সভায় কি বিপুল জন সমাবেশ' ঘটেনি? আবার যে

বিজেপি এরাজ্যে ক্ষমতাতেই আসতে পারল না কখনও, তারও সভায় সভায় কি বান ডাকেনি এক সময়? তাছাড়া সিপিএমের সভায় কিছু মানুষের অবশ্য হাজির হওয়ার সঙ্গত কারণ বর্তমান। নানা ঘোরতর অন্যায় অনিয়ম করে প্রভূত অর্থ কামিয়েছে দলের যে ঝলমলে অংশটা, তারা এবং তাদের উচ্ছিষ্টভোগীদের অবশ্যই দরকার একটা ডাকাতি সংহতি। তাই তাঁরা জড়, হয়েছিলেন ব্রিগেডে। অন্যথায়, নন্দীগ্রাম 'সূর্যোদয়' ঘটানোর জন্যে জাতির কাছে নতজানু হওয়া উচিত ছিল যাদের, তাপসীকে ধর্ষণ ও খুন করিয়ে, তার দাদুকে দোষী সাব্যস্ত করার ষড়যন্ত্র করার অপরাধে যাদের আলিমুদ্দিন থেকে তাপসীর বাড়ি পর্যন্ত নাকখত দেওয়া উচিত ছিল, তাদেরকে বাঙালি পুনর্বরণ করে নেবে বিনা প্রশ্নে, বিনা পরীক্ষায় এ কি হতে পারে?

সত্য বটে, তৃণমূল দলে সিপিএম প্রভৃতি বামপন্থী দল থেকে ঢুকছে হু হু করে। এদের কিছু অংশ যে দুষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনুপ্রবেশ করেছে, এ সম্বন্ধেও সন্দেহ নেই। সন্দেহ নেই, নিচের স্তরের তৃণমূল কর্মীদের অন্যান্য দলের থেকে আলাদা করা যায় - এমন কোনও স্বতন্ত্র আচার-আচরণ এখনও স্পষ্ট হয়নি। অন্যান্য দলকে ভালোভাবে অনুকরণ করতে পারলেই, অধিকাংশই, নিজেদের ধন্য মনে করছে। আমি বিশ্বাস করি না, ইতিহাসের এই নির্মম পরিহাসটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টির বাইরেই পড়ে থাকবে। তিনি গান্ধির কথা তেমন বলেন না বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথা বলেন। রবীন্দ্রপন্থার নানামুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিশেষত গ্রামে গ্রামে, প্রতিটি কর্মীর হাতে পৌঁছে দেওয়া যায় - বিচিত্র সব কাজ।

যত সংখ্যক চাকরি দেওয়ার কথা তিনি ঘোষণা করেছেন, তার দু-তিন গুণ বেশি স্বনিযুক্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে সে সমস্ত পথে। সংকটাপন্ন কৃষি ও পরিবেশের সুরক্ষার পথে, সামাজিক সম্পর্কের সৌন্দর্য-রূপ ও সম্প্রীতির শক্তি-রূপ প্রতিষ্ঠার পথে। অতিদলীয়তার পথে নয়। মমতার অকৃত্রিম আন্তরিকতাই তাঁকে এই সব ঘটনাবলী সম্পর্কে নিঃসাড় থাকতে দেবে না বলেই বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি বাঙালিকে শুধু রবীন্দ্রনাথের গান শুনিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন না তিনি, নতুন গ্রাম সৃষ্টিতে তাঁর দিশাকেও কাজে লাগাবেন এবার। শহরে প্রতিষ্ঠা করবেন মানবাধিকারের সুরক্ষার অন্যতম সংবেদিতা।

মমতার কোনও কোনও সাম্প্রতিক উক্তির মধ্যে কিছু অসতর্কতার প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর বিরোধীরা সুযোগ নিচ্ছে তার। একটি দৃষ্টান্ত দিয়েই এ প্রসঙ্গ শেষ করব। বর্ধমানে খুন হলেন সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক প্রদীপ তা। শোনা গেল এ দুষ্কর্মের মূল অভিযুক্ত তৃণমূলে ঢুকেছে সম্প্রতি। ছিল ওই বিধায়কের পার্শ্বচর, তার তোলাবাজির সাক্ষী। বিক্ষুধিত এবং বিক্ষুব্ধ হয়েই ঢুকেছে তৃণমূলে। এর মধ্যে গোষ্ঠী কোঁন্দলের সব উপাদান থাকলেও সম্পূর্ণত গোষ্ঠী কোন্দল বলা যাবে না একে। অথচ দিল্লি থেকে মমতা তাই বললেন। আর একটু খবর নিয়ে ধীরেসুস্থে বললে আরও তীক্ষ্ণভেদী হতো তাঁর বক্তব্য। তবু মনে করি, মমতা তাঁর পরাক্রান্ত সামর্থ্যে, এসব দুর্বলতা অচিরেই অতিক্রান্ত হবেন। কারণ বাঙালি মমতাকে পেতে চয়েছে রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ' রূপেই। মমতার মধ্যে আছে একটি মহাভাব। এই মহাভাবই তাঁকে তুচ্ছ দুর্বলতা থেকে উদ্ধার করবে অচিরেই - অবলীলায়, এমন বিশ্বাস করা ছাড়া বাঙালির আপাতত আর ভরসার জায়গা

কোথায়?

সাহিত্য পরিষদ-এর কথায় ফিরে আসবার আগে উল্লেখ করবো পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা সংসদের একটি নির্দেশিকার কথায়, যেখানে রাজ্যের সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় সেবা প্রকল্পকে বলা হয়েছে অন্য এক 'সমাজ' আন্দোলন গড়ে তোলবার কথা। কৃষি ও কৃষকের দুর্দিনে, পরিবেশের সুরক্ষায় যার ভূমিকা হতে পারে অসীম সম্ভাবনাময়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও উদ্ধার পেতে পারে অপ্রাসঙ্গিকতার দুর্নাম থেকে। কিন্তু আশ্চর্য, নতুন সরকারের সে নির্দেশিকা আজও উপেক্ষিত রয়ে গেল। পুরনো কুশীলবেরা অনেক ক্ষেত্রেই আত্মঘাতী ভূমিকাতেই স্বাচ্ছান্দ্য অনুভব করে। এর থেকে বিষাদের আর কী হতে পারে? বর্তমান প্রতিবেদক ওই আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত বলেই পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুভব করেন মর্মে মর্মে।

এরই মধ্যে ঘটল সাহিত্য পরিষদ-এর ঘটনা। ২০০৯ সালেও ঘটেছিল। সে সময় বর্তমান মন্ত্রী রবিরঞ্জনবাবুকে শুধু মারতে বাকি রাখা হয়েছিল। তাঁর অপরাধ ছিল, বাঙালির গর্বের ও সারস্বত প্রতিষ্ঠানটিকে দলের দখলমুক্ত করতে চাওয়া। বলা বাহুল্য, সেদিন তিনি কোনও দলের প্রতিনিধি হয়ে যাননি। গত রবিবারেও আবার ঘটল। পরিষদ-এর প্রাক্তন(?) সম্পাদক ড. স্বপন বসুর এক অন্যায্য উক্তির প্রতি দৃষ্টি দেব। ড. বসুর মতে, ওই দিনের ঘটনার মূলে আছেন, মাননীয় মন্ত্রী ড. রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর মতে নতুন সদস্যদের তিনিই লেলিয়ে দিয়েছেন হট্টগোল করার জন্য। কোনও প্রমাণ না দিয়েই তিনি কথাটা বলেছেন। কিন্তু ড. বসু কি বলবেন, বর্তমান প্রতিবেদক বহুদিনের আজীবন সদস্য হওয়া সত্ত্বেও কেন আজও নির্বাচকমন্ডলীভুক্ত হননি? চিঠি পাননি? ডাক বিভাগের ত্রুটি? কে না জানে বাংলায় অনেক কিছু ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাক ব্যবস্থাও লাটে উঠেছে! সেক্ষেত্রে যথা সময়ে যথোচিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কেন?

আজও কতজন চিঠি পাননি এরকম, তিনি বলবেন কি? তিনি কি তাঁর মাথাটা একটু খাটাতে রাজি হবেন যদি আমি তাঁর সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে একটি তথ্য দিই? বর্তমান প্রতিবেদক ছাড়াও আরও অনেক পুরনো সদস্য আছেন যাঁরা রবিরঞ্জনবাবুর অত্যন্ত কাছের ছাত্র কিন্তু চিঠি না পাওয়া সত্ত্বেও তাঁর কাছ থেকে কোনও প্ররোচনা পাননি? তিনি যদি এতটাই তৎপর তাহলে এই লাগসই কাজটায় এতটা উদাসীন থাকতে পারলেন কী করে? বর্ধমান থেকে ধাওয়া করে যাওয়ার অসুবিধা? ২০০৪ সাল থেকেই আমরা কি গণমুক্তি পরিষদের তথা তাঁরই ডাকে দলে দলে সোৎসাহে হাজির হইনি কলকাতার সভায় এবং রাস্তায় রাস্তায় সেই দুর্ধর্ষ ভয়ের দিনগুলোতে?

তুচ্ছ বিদূষণের কথাটা বড় নয়। আমরা বার বার বলেছি, শুধু পরিবর্তন নয়- বাঙালি জাগতে চাইছে আজ নবীন প্রাণের আনন্দ। নতুন বাণী খুঁজছে সে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে লাগুক নবীনতার ঢেউ। এক দলকে হঠিয়ে অন্য দলের আগমনেই তা ঘটে না, একথা হয়তো বানরেও বোঝে। কিন্তু একটা দলকেই কেন যে কোনও মুল্যে - এমনকি মিথ্যা বিদূষণের মূল্যেও টিকে থাকতে হবে শেষ পর্যন্ত?

সিপিএম নয়, চাই সিপিএম-তন্ত্রের নির্বাসন

শিক্ষা-স্বাস্থ্য-শিল্প-কৃষি সব ক্ষেত্রেই বাংলার পশ্চাৎপদতা আজ বহু আলোচিত। প্রায় এক কোটির কাছাকাছি বেকার এবং চার কোটির কাছাকাছি দরিদ্রসীমার নীচের মানুষ নিয়ে, ভারতের একসময়ের সব থেকে অগ্রসর রাজ্যটি আজ যেন এক ডুবন্ত টাইটানিক। আরও এক বা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত সে যেন বিলুপ্তই হতে চলেছে। তিন দশকেরও বেশি সময় বোবা বাঙালির নিঃশব্দ, নিঃশর্ত, নিষ্প্রশ্ন সমর্থন লাভ করে সিপিএমের নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার স্থায়িত্বে প্রায় বিশ্ব রেকর্ড করেও বাংলার মানুষকে দিতে পারেনি প্রত্যাশিত স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য।

এই প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ার ব্যাপারটা বোঝবার জন্য বিশেষজ্ঞ হবার দরকার নেই। সাধারণ বুদ্ধিতেই আন্দাজ করা যায়। জনগণের 'সেবা' করবার এমন প্রলম্বিত অবসর লাভ করবার পরও আসন্ন নির্বাচনে সরকার পক্ষের হতাশা লক্ষ করবার মতো। সেবার 'সাফল্য স্বরূপ' অষ্টমবারের 'নির্বাচনে সরকার পক্ষ আমরা ২৫০, ওরা ১৫- এমনটা বলতে পারবার ভরসা দেখছে না, এটা স্পষ্ট। আসন সংখ্যা পঞ্চাশেও নেমে আসতে পারে, এমন শঙ্কা তাঁদের তাড়া করছে বলেই মনে হয়। ওপরের তলার ঘুরে দাঁড়ানোর আওয়াজ তোলার পাশাপাশি নীচের তলার মানুষদের প্রচারগুলি লক্ষ করবার মতো তাঁদের মুখে মুখে শুনি তৃণমূল ক্ষমতা পাঁচ বছরও ধরে রাখতে পারবে না বলে এক ধরণের খেদোক্তি।

এই খেদোক্তিগুলির মধ্যে পরাজয়ের সরল স্বীকারোক্তিই কেবল লুকিয়ে আছে, তা বলা যাবে না। ঘুরে দাঁড়ানোর যে যে ব্যবস্থা তাঁরা গ্রহণ করেছেন এই খেদোক্তিগুলিও তারই অংশ। নিজেদের কাজের সাফল্যের ওপর ভরসা হারিয়ে সিপিএম যে সন্ত্রাসকেই একমাত্র অস্ত্র করেনি, একথা ভালো করে বুঝতে হবে কিন্তু। সিপিএম সন্ত্রাসবাদী দল হলেও একথা বলা যায়। শুদ্ধির কথা বলে, উন্নততর হয়ে ওঠার প্রসঙ্গ তুলে, সন্ত্রাসের সহনযোগ্যতা বৃদ্ধির মোলায়েম কৌশল সিপিএমের অজানা নয়। সেইজন্যে সিপিএমের আসল শক্তির উৎস, সন্ত্রাস নয়। সন্ত্রাসের সহনযোগ্যতা বৃদ্ধির কৌশলই সেই উৎস। এর জন্য স্ট্যালিনপন্থী সন্ত্রাসবাদী দলটিকে সংযম সাধনা করতে হয়েছে, মাত্রাবোধের শিক্ষা নিতে হয়েছে। এই মাত্রাবোধ থেকেই লোভ ও ভয়ের আপাত বিপরীত বৃত্তিগুলোর যথোচিত ব্যবহারও সম্ভব হয়েছে। বিরোধীপক্ষের নেতাদের কিনে নেওয়া গেছে আর নীচের দিকে পড়ে থেকেছে বিমূঢ় বোবা উদ্বেগ আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী! অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন, সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম-নেতাইয়ে কী সংযম, কী মাত্রাবোধ তুমি দেখলে? দেখিনি। কিন্তু ওটা তো অন্য সিপিএম। পতনোন্মুখ সিপিএম। উত্থানোন্মুখ সিপিএম নয়। ধরা পড়ে-যাওয়া সিপিএম। হয়তো কিছুটা 'মতিভ্রষ্ট সিপিএম'।

নিশ্চয়ই, এতখানি মতিভ্রষ্টতা সিপিএম-এ ইতিপূর্বে কখনোই দেখা যায়নি। প্রশ্ন করতে পারেন, সাঁইবাড়ি কেশপুর, সূচপুর ধানতলা বানতলায় কোন সিপিএম? উত্তরে বলব, ওখানে বনেদি সিপিএম, বিস্তারশীল সিপিএম। স্থান-কাল ও পাত্র বিচারে ওই কর্মপ্রকল্পগুলি অত্যন্ত সুখপ্রদ ফলই প্রসব করেছে। যুক্তির খাতিরে অবশ্যই স্বীকার্য যে, কাগজে কাগজে উল্লেখিত ওই সব সশব্দ ঘটনাই সিপিএমের ভোটে জেতার বিশ্ব রেকর্ড গড়ার,

যথেষ্ট হলেও, একমাত্র কারণ নয়। ওগুলিতে বাঙালি সিপিএমকে চিনতে ভুল করেনি ঠিকই। কিন্তু ওগুলি ঘন দুর্যোগের রাত্রিতে বজ্রগর্জনের রবে চমকে দিলেও অন্য ভয় বাঙালিকে আরও শিউরে দিয়েছিল। পিঠের কাছে সাপের হিসহিসানির মতো শব্দ সেই রাত্রির ভয়কে যেন আরও জমাট করে তুলেছিল। এই হিসহিসানিগুলো ছিল প্রায় প্রতি বুথে ঘটানো এক-একটি প্রায় নিঃশব্দ মৃত্যু। সবাই জানি, এসব ঘটে । কিন্তু লক্ষ করবেন, বুথ প্রতি একের বেশি খুন খারাপির -স্পেশাল ছাড়া - সাধারণ পারমিট ছিল না। যদি থাকতো, সিপিএম ৫/১০ বছরেই ছাতু হয়ে যেত। শুধু হত্যা দিয়ে নয়, অসুবিধে সৃষ্টি ও অবমাননার পরিমাণমতো ব্যবহারে সিপিএম ছিল অত্যন্ত কৌশলী। একজন শিক্ষককে বা কর্মচারীকে হেনস্তার চূড়ান্ত করতেও সিপিএম নির্দ্বিধ শুধু নিষ্ঠুরতার প্রতি উদ্দেশ্যহীন অনুরাগবশত নয় ৯৯ জন শিক্ষককেই সহবত শেখানোর প্রয়োজনে। এই যে বোবা অবস্থায় সকলকেই সমর্থক হিসেবে পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা—এতেই সিপিএম অভ্যস্ত এবং সন্তুষ্ট। এতেই সিপিএমের উত্তুঙ্গ উত্থান এবং এতেই তার অতলান্ত পতন।

অনেকে বলতে পারেন, উত্থান যদি এতটাই হয় - এবং তার সঙ্গে সঙ্গে স্থায়িত্ব, তাহলে ওঠবার জন্যে এবং টিকে থাকবার জন্যে সিপিএমের পথই তো শরণ্য। এইরকম একটা স্থুল যুক্তির প্রভাবেই নয় শুধু, ঘৃণার স্বাভাবিক লজিকেও সিপিএমের পতনের গভীরতা ও ব্যাপকতা এখনই হয়তো স্পষ্ট হবে না সকলের কাছে। সত্য দৃষ্টি নয়, ঘৃণা যেখানে বড় হয়ে ওঠে, সেখানে ঘৃণ্যের প্রতি নিন্দার পরিমাণ অনুপাতে ঘৃণাকারী অ-নিন্দনীয় হয়ে ওঠে না। ঘৃণার মনস্তত্ব এবং স্থূল-যুক্তির প্রভাবে স্বভাবে আসে শৈথিল্য। এই শৈথিল্য থেকে ভুল উত্থান বা বীভৎস স্থায়িত্বকেও গৌরবের দৃষ্টিতে দেখতে উৎসাহিত হয় মন। সেই উৎসাহে অনুকরণ করি তাকেই - যাকে চেয়েছি শুধু ঘৃণাই করতে। এই বিড়াম্বনাকে আগাম চিনে নিয়ে সতর্ক হওয়া সম্ভব। কারণ, সিপিএমের বাদশাহির চৌত্রিশতম বছরে সিপিএম ক্ষমতাচ্যুত হবে কি না - তর্কটা আর সে জায়গায় নেই। এখনকার তর্ক হল, সিপিএম আগামী পাঁচ বছরেই ফিরে আসবে কিনা। এবং তারপর সিপিএমের এই শ্বাসরোধী শাসন আরও অর্ধ-শতাব্দী সম্প্রসারিত হবে কিনা।

আমার মনে হয়, সিপিএম পাঁচ বছরেই ফিরে আসবে। বিরোধীরা যদি দিশাহারা হয়ে সিপিএমকেই অনুকরণ করে বসে কিছুটাও। সিপিএম না মানলেও এই কথাটা দিনের আলোর মতো সত্যি যে, বাংলার মানুষ আজ পরিবর্তন চাইছে সর্বান্তঃকরণে। বাংলার অন্তঃকরণকে ঠিকমতো না বুঝে বিরোধীদের কেউ কেউ যদি মনে করে যে, সিপিএমের দশ-বিশ হাজার হার্মাদকেই হঠাতে চেয়েছে বাংলা- সিপিএমিতন্ত্রকে নয়, হার্মাদ ব্যবস্থাকে নয়, তাহলে সেটা হবে সব থেকে বড় ভুল।

অনেকে মনে করেন সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম এবং 'শেষমেষ' নেতাই-এ সিপিএম আলপটকা এমন গাফিলতি করে ফেলল যে, রাজত্বকালের হাফ বা ফুল সেঞ্চুরি কোনওটাই আর হল না। অকালে সট্‌কে পড়তে হল। একদিক দিয়ে কথাটা ঠিক। আগে আগে সন্ত্রাস অনেক বেশি সৃষ্ট হলেও সারা রাজ্য বোবা উদ্বেগে বিমূঢ় হলেও,

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্বেই উত্তাপ স্ফুটন-বিন্দুতে পৌঁছয়। কিন্তু তাই বলে এমন মনে করবার কোনোই কারণ নেই যে, উত্তাপের ক্রম-সঞ্চয় ঘটছিল না।সন্ত্রাসের হাড়-কাঁপানো হিস্‌হিসে শিহরণে বোবা হয়ে যাওয়া বুথে ছিল হাড় কাঁপানোর উত্তম ব্যবস্থা। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের অতিরিক্ত একটি চতুঃস্তরায় হার্মাদি স্তর ছিল প্রায় প্রতিটি বুথে। এদের মধ্যে অনেকেই আবার গৌতম দেব কথিত 'বহিস্কৃত'। কিন্তু এ বহিষ্কার 'চোখ-টেপা' বহিষ্কার। সদর দরজা দিয়ে বহিষ্কার করে খিড়কি দিয়ে আবার ঢোকানো। এরা ভাইয়ে ভাইয়ে কিংবা স্বামী-স্ত্রীতে বিবাদ বাধলে বা বিবাদ বাধার উপক্রম মাত্র হলে, দ্রুত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়ে, দুই পক্ষেরই অতি-কাছে অবস্থান গ্রহণ করে। পরিচর্যার দ্বারা বিবাদ সুবিকশিত হলে, দু'পক্ষের কাছ থেকে দু'পক্ষই উপযুক্ত নজরানা-সহ সাময়িকভাবে কিছুটা অনতিদূর অবস্থানে ওঁৎ পেতে থাকে। হাজার জনের মধ্যে ১০-১৫ জনের ছিল এমনটাই জীবিকা। অত্যন্ত আয়দায়ী জীবিকা। স্থানে স্থানে এরা গৃহস্থকে গ্রামছাড়া করে। কারণে অকারণে জায়গা জমিকে বিতর্কিত করে তুলে বিপদভঞ্জনের জন্য যথা-রুচি নজরানা চায়। কোনও বারোয়ারি জায়গায় এক-একজন মালিকমাত্রকে হাত করে সমস্তটাই বিক্রি করে দেয়। বিক্রি করতে করতে অনথিভুক্ত কিন্তু আশি বছরের পুরনো রাস্তাকেও তারা বিক্রি করে দেয়। এইরকম একটি বিক্রি হয়ে-যাওয়া রাস্তার পুনরুদ্ধার সম্ভব হল সম্প্রতি, বিক্রি হয়ে যাওয়া সরকারি স্কুলের জায়গার বিনিময়ে। ওই 'বহিষ্কৃতরা' রাস্তা বিক্রি করে ফেলেছে বলে তাদের সম্মানার্থে, এগিয়ে এল পার্টি। ইস্কুল তার বাপোত্তর সম্পত্তি। ইস্কুলের জায়গা দিয়ে তাই তৈরী হল প্রশস্ততর রাস্তা। সঙ্কুচিত হল শিক্ষার ক্ষেত্র।

আমার বিশ্বাস, বাংলায় এমন হাজার হাজার বুথ আছে যাদের এক-একটি থেকে ওই 'বহিষ্কৃত' পার্টি কর্মীরা এই চৌত্রিশ বছরে কোটি টাকার ওপর কামিয়ে থাকবে। এদের অনেকে পার্টির কোনও পদাধিকারী নয় ঠিকই। কিন্তু পার্টি এদের সহ্য করে কেন? ব্যবহার করে কি? ভোটের সময় এদেরই কি দেখি চ্যাটায় বসতে? এরাই কি সেদিন বর্ধমানের উপকণ্ঠে জনৈক ভদ্রলোকের প্রায় তিরিশ লাখ টাকার সম্পত্তি এক চালকল মালিকের হাতে তুলে দিচ্ছিল পার্টির মূল স্রোতের সহায়তায়? বিপন্ন গৃহস্থ দু'লাখ টাকা খরচ করে গুন্ডা লাগিয়ে কেনওরকমে সম্পত্তি উদ্ধার করেন? ওই দু'লক্ষ টাকা খরচ করবার ক্ষমতা না থাকলে তিনিও কি মাওবাদী হতে বাধ্য হতেন? মাওবাদী কারা? একশো শতাংশ সিপিএমি ভোটারের মধ্যে এরা এল কোথা থেকে? ৮০/১০০ বছরের ভোটার থাকা সত্ত্বেও ৯০/১০০ শতাংশ ভোট হয়েছে সিপিএম রাজত্বের প্রায় প্রথম তিরিশ বছরই, সেখানে কলেজে কলেজে ভোটের শতাংশ চল্লিশের নীচে কেন? তাদের নবীন পায়ে বাত হয়েছে, না তাদের বোবা করে দেওয়া হল? গ্রামাঞ্চলের কলেজে যেখানেই পঞ্চাশ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে সেখানেই সিপিএম হারছে বলেই কি ভোটিং পারসেন্টেজে রেকর্ড সৃষ্টিকারী সিপিএম উল্টো রেকর্ড-সৃষ্টির অভিসন্ধিতে যুক্ত হয়ে পড়ল? অদৃষ্টের এ এক আশ্চর্য পরিহাস — রিভার্সাল অব ফরচুন।

জীবনের মতো গণতন্ত্রেও আছে ওঠাপড়া। বারবার ভুল স্বীকার করা সত্ত্বেও হার মেনে নিয়ে অন্তত

পাঁচ বছরের জন্য ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে সিপিএমের এত ভয় কেন? সব কিছু প্রকাশ হয়ে পড়লে পঞ্চাশ বছরেও প্রত্যাবর্তন অসম্ভব এমন আশঙ্কায় কি ভীত সে?

বাহিরের দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে, যে-গরিবের পিঠে সিপিএম ক্ষমতায় এল, বিদায় নিচ্ছে সেই গরিবেরই বিরুদ্ধে বন্দুক হাতে। কিন্তু ভেতরের ব্যাপারটি কী? সে আসলে, সীমাহীন স্ব-বিরোধিতাতে উপনীত হওয়া। নিজেদেরই ঘোষিত নীতির প্রতি বিশ্বাস দেউলিয়া হয়ে যাওয়া। কৃষি ব্যাপারে আনাড়ির ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া।

রাশিয়ার মতো সরকারি কৃষির পক্ষপাতী সিপিএম কখনোই হয়নি। বরং পারিবারিক কৃষিকেই সমৃদ্ধ করতে চেয়েছে যেন। কিন্তু 'রয়েছে সাধ, না জানি তার সাধনা'। ফলে, পারিবারিক কৃষি বিপন্ন হতে বসেছে। সিপিএমেরই হাতে সব থেকে বেশি। দু'বিঘের বৃদ্ধার সঙ্গে দিন-মজুরের চলেছে 'লড়াই-লড়াই-লড়াই'। নীচের দিকে শ্রেণী সংঘর্ষের মহিমা যখন পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত, ওপরের দিকে তখনই শুরু হয়েছে শ্রেণী-সমন্বয়ের মনোরম মস্তি। মন্ত্রী-আমলাদের সঙ্গে মাল্টিন্যাশনালদের। এই সূত্রেই ম্যাকিনসেকে দিয়ে কর্পোরেট কৃষির প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হয়েছিল সিপিএম। সম্প্রতি টাটা-জিন্দাল সালেমদের হাতে হাজার হাজার একর জমি তুলে দেওয়ার মধ্যে কর্পোরেট কৃষিকেই পোষকতার পরোক্ষ চেষ্টা। কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ এই কথার মধ্যে শুধু নিরীহ স্ববিরোধিতা নয়, আছে শুদ্ধ মূর্খতা। শিল্প শুধু ভবিষ্যতে থাকবে? বর্তমানে নয় এবং অতীতেও ছিল না? আর, ভবিষ্যতে কৃষি থাকবে না আর? কী বলতে চান তাঁরা? কৃষি ও শিল্পের যথোচিত যৌথতাই যে সভ্যতার ভিত্তি ও ভবিষ্যৎ দুই-ই, এই সমগ্রতাটা ধরতে তাঁদের অসুবিধে হল কেন?

অনেকে সিপিএমের অতি বড় শিল্পপতি দর্শনে আহ্লাদের মধ্যে নিম্নবিত্ত-নিম্নরুচিসুলভ আদেখ্‌লেপনা-জনিত আতিশয্যেরই সন্ধান পেয়েছেন। জ্যোতি বসু একবার নিকো পার্কের প্রসঙ্গে 'ভিখিরিদের' প্রতি তাচ্ছিল্য গোপন করতে পারেননি। যে-মানসিকতা থেকে 'ভিখিরিদের' তাচ্ছিল্য করা যায়, টাটা-সালেমদের পাশাপাশি বসতে পারার সৌভাগ্যে উতলা হাওয়ার জন্যে তার থেকে উচ্চতর মানসিকতার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু শুধু এই কারণেই এঁরা প্রায় পঞ্চান্ন হাজার ছোট-বড় শিল্পকে নষ্ট করার পর শিল্প শিল্প করে ককিয়ে উঠলেন, তা বলা যাবে না। সাম্ভাব্য কাটমানির খেলাকেও মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দিলে ভুল হবে।

আসল কথা, সিপিএম খুব ভালোভাবেই জানে, শুধু মানি-তে কাজ হয় না, পাওয়ারও চাই। পাওয়ার শুধু মাস্‌ল-সর্বস্ব হলেও চলে না। সিপিএমের ওপরতলার অতি অল্প ক'জন খুব ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে, এই শতাব্দীতে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে কৃষি। আগামী কয়েক দশকের মধ্যে পৃথিবীতে যখন লোকসংখ্যা বাড়বে আরও দু'শো কোটি, তখন প্রায় চল্লিশ শতাংশ কৃষিজমি চলে যাবে কৃষি-সীমার বাইরে। অল্প জমিতেই অত্যাধিক উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা তৈরী হবে। তীব্র প্রতিযোগিতা তৈরী হবে কর্পোরেট কৃষি ও পারিবারিক কৃষির মধ্যে। পারিবারিক কৃষির দুই প্রধান শক্তি প্রাকৃতিক কৃষি-প্রযুক্তি এবং তার উপযোগী সমাজ-প্রযুক্তি বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ায় এবং বিকল্প প্রযুক্তির উদ্ভাবন অনায়ত্ত থাকায় কৃষিতে হই হই করে ঢুকে

পড়বে কর্পোরেট কুল - যাদের হাতে এখন পৃথিবী পরিচালনার ভার। সহজ স্বাভাবিক কৃষির জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হবে - শিল্পায়িত কৃষি। মানি ও পাওয়ার আরও বিপুলতর মাত্রায় পুঞ্জীভূত হবে ওই তরফে। এইখানেই সিপিএমের বুদ্ধিমত্তা। এইখানেই তার সীমাহীন স্ববিরোধিতাও। প্রকাশ্যে গলার শির ফুলিয়ে যাকে শাপ শাপান্ত করি, তাকেই আবার ভক্ত ভগীরথের মতো পথ দেখিয়ে নিয়ে আসি - এই স্ববিরোধিতাই হয়ে উঠেছে সিপিএমের মারণ রোগ।

পারিবারিক কৃষি লুপ্ত হলে কী হবে? এই বাংলার আরও অন্তত দু'কোটি মানুষ নতুন করে যোগ দেবে বিরাজমান বেকারের দলে। একটি দলের মানি ও পাওয়ার বৃদ্ধির জন্যে বাংলা এত দূর মূল্য দেবে? সিপিএমের কাছে নেই এই মহাসঙ্কট থেকে বাঁচবার মন্ত্র। সে শুধু ভাঙতেই জানে। সমাজ এমনকী, পরিবারকেও। ফলে আগামি দিনের সব থেকে বড় যুদ্ধের ক্ষেত্রে সিপিএম কর্পোরেটের পক্ষ নিয়েছে। শুধু অল্প কিছু দৃষ্টান্ত এবং অনেকটা অনুমান থেকে বলছি না। কঠিন অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। গত দশ বছর ধরে পারিবারিক চাষ ও সবুজের সুরক্ষায় বর্তমান লেখক রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা বিভাগের তরফ থেকে একটি সবুজ আন্দোলন বা নতুন তেভাগা আন্দোলনের চেষ্টা করেছিলেন।

অধ্যাপক অম্লান দত্ত সেই ২০০২ সাল থেকে বারবার যোগ দিয়েছেন এ সংক্রান্ত নানা সভায়। বলেছিলেন, 'এই আন্দোলন সমাজভিত্তিক সবুজ-সৃজন নয়, সবুজ ভিত্তিক সমাজ-সৃজন।' বর্তমান লেখককে বলেছিলেন, 'আমাকে লোকে এতদিন বলেছে, তুমি শুধু সমস্যার কথাই বললে, সমাধানের কথা বললে না (এই লেখকের মতে, কথাটা যদিও সত্যি নয়।) কিন্তু লোকে যখন আমার কথা ও তোমার কাজকে মিলিয়ে দেখবে, তখন আর একথা বলতে পারেব না, রাজ্যের উচ্চশিক্ষা বিভাগও ২০১০ সালেই রাজ্যের ১৭টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় সেবা প্রকল্পের মাধ্যমে এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার নির্দেশ দেন।

আজ পর্যন্ত কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ই কোনও আন্তরিকতাই প্রকাশ করেনি সচিব-স্তরের নির্দেশ মেনে কিছু করার ব্যাপারে। কারণ, সেগুলি এখন আর মুক্ত চিন্তার দুর্গ নয়, দলের দাসালয়। তারা দেশ চেনে না, দল চেনে। ইচ্ছার দৈন্য ও বুদ্ধির ভীরুতা এই আলয়গুলির অস্তিত্বকে কালিমা-লাঞ্ছিত করেছে। এঁদের দ্বারা দিনগত পাপক্ষয়ও হবে কিনা জানি না। তবে স্বপ্ন দেখা সম্ভব যে নয়, তা এঁদের আচরণেই স্পষ্ট।

এই লেখকের মতে, আগামি দিনের সব থেকে বড় যুদ্ধের ক্ষেত্রটায় সুযোগ রয়েছে জাতির জন্যে সব থেকে বড় কাজটা করবার। বাঙালি জীবনে তৃতীয় নবজাগরণ সংঘটনের। বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত পারিবারিক কৃষি ও প্রাকৃতিক কৃষির পুনরুজ্জীবনের পথে, কৃষিকেন্দ্রিক শিল্পের দেশীয় ও বিশ্ববাজার ধরবার পথে, বিপুল মানুষের জীবন ও জীবিকার সুরক্ষার পথে বলিষ্ঠতম পায়ে চলতে গেলে আজ চাই বাংলার প্রথম ও দ্বিতীয় নবজাগরণের বাণীকে সমন্বিত করা। 'আত্মীয় সামাজিকতা' ও 'বৈশ্য সামাজিকতা' - উভয়ের মধ্যে চলাচলের একটা পথ আবিষ্কার করা। দুই সমাজ প্রকৃতির শক্তি ও সীমাবদ্ধতার স্থানগুলি চিহ্নিত করে উভয়ের শক্তিকে কাজে লাগানোর আয়োজন করা। তার দ্বারা শুধু ছয় কোটি গ্রামবাসী বাঙালির জীবন ও জীবিকার সুরক্ষাই শুধু

নয়, শহরজীবনেও আসবে স্বস্তি। আমরা কাজের সূচনামাত্র করেছি, চিন্তারও একটা মুখপাত রচনা করেছি - যেখানে ক্রমশ সকলে মিলে ভাববার ও কাজ করবার অবসর তৈরি হতে পারে। এক বিপুল কর্মান্দোলনের শুভারম্ভ হতে পারে। বছরের নয়, পঞ্চাশ বছরের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের মতো লুপ্ত হতে বসা বাংলার পুনরুদ্ধার সাধনে আজ চাই তৃতীয় নবজাগরণ। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর অন্ধকার যুগের পরে যেমন এসেছিল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর যুগান্তর, অষ্টাদশ শতাব্দীর আপজাত্যের অবসানে ঊনিশ শতকে ঘটেছিল যেমন নব নব উন্মেষ, দুই মহাযুদ্ধ ক্লান্ত, বিভাগ-বিধস্ত, চিন্তা ও চারিত্রদৈন্যে দীর্ণ আজকের এই বাংলার সীমাহীন অধঃপতনের উত্তর কিছুতেই হতে পারে না - কেবল পরিবর্তন।

তৃণমূল স্তরে সর্বসম্মত ভিত্তিতে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনই বাঞ্ছনীয়

স্বাধীনোত্তর রাজনীতিতে বিভীষিকাময় দলতন্ত্রের বিকল্প সন্ধান প্রসঙ্গে এক ধরনের তৃণমূল সমাজতন্ত্রের কথা উঠে এসেছিল। এর কার্যকারিতা তথা ব্যবহারযোগ্যতা সম্পর্কে অনেকে উৎসাহ এবং সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এঁদের কারও কারও প্রশ্ন, কোনও দলের বিকল্প যখন বিরোধী দল, তখন দলতন্ত্রের দোষস্খালন করতে সচেতন বিরোধী দলই যথেষ্ট। সেইই যোগ্যতম ভূমিকা পালন করতে পারে। সেটাই দৃষ্টিগ্রাহ্য বাস্তবতার মধ্যে পড়ে। বাদবাকিটা আপাতত কল্পনার অধীন। সুতরাং সে কারণে শুনতেই মনোরম। কিন্তু বিকল্প হিসেবে অবাস্তব।

ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের বর্তমান প্যাটার্নটার মধ্যে দলের যে রূপ ফুটে উঠেছে তাতে বিরোধী দলের পক্ষে ক্ষমতাসীন দলের রীতি-প্রকৃতি থেকে বেশি দূরে যাওয়া শুধু অসম্ভব নয়, কল্পনা করাটাও অবাস্তব। প্রথমত, সব দলকেই কতকগুলো সাধারণ নিয়মের ওপর চলতে হয়। একটা দল চালাতে ভোটযুদ্ধে লড়তে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে টন টন টাকা লাগে। এসব টাকা আসে কোথা থেকে? কারও কি সন্দেহ আছে যে তা আসে প্রধানত অপরাধ জগৎ থেকে - চোরাকারবারী, অস্ত্র ব্যবসায়ী, জমি মাফিয়া প্রভৃতি দুর্বৃত্ত গুন্ডা বা গুন্ডা-আশ্রয়ী জগৎ থেকে? দল এইভাবে টাকাও নেবে আবার অপরাধও দমন করবে - এমন আশা করা দলের প্রতি চূড়ান্ত অবিচার। আমরা দলের শক্তিমান দিকটাই দেখি, তার অসহায়তার দিকটা দেখি না!

তার মানে এই নয়, দলে সজ্জনেরা একেবারেই জায়গা পান না। যেটুকু পান তাতে দলের শোভাবর্ধন করতেই পারেন। কিন্তু কোনও বিকল্প চিন্তাকে জায়গা করে দিতে চেষ্টা করলে অচিরেই ব্রাত্য হয়ে ব্যর্থ হয়ে যান। এমনকি, কোনও কোনও মুখ্য বা প্রধানমন্ত্রী নিজে ব্যক্তিগতভাবে সৎ হলেও দামাল দলেরই দুর্বৃত্তের সামনে, পরাক্রান্ত নেতা বা নেত্রী হওয়া সত্ত্বেও, স্রোতে ভাসমান ঐরাবতের মতোই অসহায় বোধ করেন। এই অসহায়তার কারণ দলের সঙ্গে সমাজ না থাকা। আর সমাজ মানে অনেক কিছু — তার সংস্কৃতি তার কার্যকারিতা, তার নীতি-নৈতিকতা, তার স্নেহ-প্রীতি, তার সংকোচন-প্রসারণশীলতা। তার শক্তি এবং দুর্বলতা। সমাজের কতকগুলি দুর্বলতার কারণে তাকে পুরোপুরি অবলুপ্ত করে দিয়ে দলকেও আজ কী পরিমাণে নিঃস্ব এবং রিক্ত করা হয়েছে তা বলে শেষ করা যায় না। দলের এই নিঃস্বতা ও রিক্ততার ছায়া যখন পড়ে নেতানেত্রীর ওপর, তখনই তিনি অসহায় হয়ে যান।

শুধু নেতানেত্রীর অসহায়তাই দল-সর্বস্বতার প্রধান দুর্বলতা নয়। দলসর্বস্বতা মানুষের পরিমিত যান্ত্রিক অংশটুকুর মর্মকে গ্রহণ করে - কিন্তু তার অপরিমিত সৃষ্টি শক্তিকে নয়। বেশ কিছুদিন ধরে স্বয়ম্ভর সবুজ আন্দোলনের যে কথা আমরা বলে আসছিলাম সে বিষয়টাকে নিয়ে দু'কথা বললেই ব্যাপারটা কিছুটা স্পষ্ট হবে। আমরা যা বলছিলাম তার মোদ্দা কথা ছিল তিন সংকটের এক সমাধান'। তিন সংকট হলো, পরিবেশ, কৃষি

ও নিযুক্তির। তিনটি ক্ষেত্রেই ঘটেছে আজ মহা বিভ্রাট। আমরা বলছিলাম, স্বরোজগারের ব্যবস্থার সঙ্গে পরিবেশ ও কৃষির মহাসংকটে একটা স্পষ্ট, বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা নেওয়া যায়। যার জন্য চাই গ্রাসরুটে এক অন্য ধরনের গণতন্ত্র, সব রকমের আমরা-তোমরাহীনতা। আমাদের দেওয়া পরিকল্পনায় দাবি করা হয়েছিল, গ্রামবাসী হাজার জনের মধ্যে ৫০ থেকে ১০০ জনের বছরজোড়া স্বরোজগার সম্ভব একশো দিনের মতো কোনো কাজের টাকাতেই। বাদবাকি ৯০০ থেকে ৯৫০ জনেরই, ওই রকম কোনও কাজের মধ্যে না থেকেও তার দুই থেকে দশ গুণ আয় হওয়া সম্ভব। শুধু অব্যবহৃত জল ও জমির এবং সেই সঙ্গে হাতের সুব্যবহারের দ্বারা।

এই রকমের কর্ম আন্দোলনে এই রাজ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের অনুমোদন ও উৎসাহও আদায় করা গিয়েছিল। উচ্চশিক্ষা ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত জাতীয় সেবা প্রকল্পের শীর্ষকতা ড. অতীন্দ্রনাথ দে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর অনুমোদনক্রমে রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে কাজটির পরীক্ষা করবার নির্দেশিকা জারি করেন। গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ স্বরোজগার যোজনার কমিশনার দিব্যেন্দু সরকার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কে লিখিতভাবে জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় সেবা প্রকল্প একশো দিনের কাজে পরিকল্পনা দেওয়া ও তার পরিচালনা করার বিরল অধিকার এবং সম্মান প্রাপ্ত হয়েছে।

মুশকিল হচ্ছে, সে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া গেল না কিছুতেই। একশো দিনের কাজের টাকা লুঠ করে তারা কোনও প্রকৃত কাজে যেমন উৎসাহ পায় না, জাতীয় সেবা প্রকল্পের বড়ো একটা টাকাও বিশ্ববিদ্যালয় তোলা হিসেবে নিয়ে ফেলে বলে ফাইল ওয়ার্কের বাইরে যেতে একেবারেই বিভ্রান্ত বোধ করে। পরিবর্তনের পরেও ব্যবস্থার কোনও বদল হলো না। বিশ্ববিদ্যালয়দের করুণ পরিণাম দেখে তেনয়ন জলে ভেসে যায়। শুধু বিদ্যার উৎপাদন-ভূমি না বয়ে বিদ্যার বিতরণ-ভূমি হয়েছে বলেই নয় শুধু। অব্যবহিত সমাজ ও বিদ্যাবিতরণ-কেন্দ্রে মাঝখানে উঠেছে এক অলঙ্ঘ্য অদৃশ্য প্রাচীর। সম্ভাবনার দেওয়া-নেওয়া শুধু বন্ধ হয় নি, লুপ্ত হয়েছে তা কল্পনায় আনবার সামর্থ্যও। যেমনটা নালন্দার ক্ষেত্রে ছিল। তাই দলই উপাচার্য থেকে ঊর্ধ্বতন সব পদাধিকারীকে দাস হিসাবে পেতে চায় না শুধু, পদাধিকারীরাও 'অভাবের সংসারে' দাস হতে পারাকেই সৌভাগ্য বলে মনে করেন। কারণ এঁরা মুক্ত চিন্তক নন, বিদ্যার বহনকারী, ভারবাহী মাত্র। সৌভাগ্যবান হলেও, অভিশপ্ত। দেবযানীর কচকে দেওয়া অভিশাপ এঁদেরও গায়ে লেগে গেছে, অব্যবহিত সমাজকে অবহেলা করার বাস্তবতার মধ্যে পড়ে। দেবযানীর মতো উপেক্ষিত সমাজও এঁদের অভিশাপ দিয়েই চেলেছে ঃ

যে বিদ্যার তরে
মোরে কর অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ - তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ
মোট কথা, শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।

সমাজ-সম্পর্কিত কাজের অনুষঙ্গটিকে তাঁরা উট্‌কো উৎপাতরূপেই চিনলেন শুধু, অন্য কিছু ভাবতেই পারলেন

না। সকলে নন, কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতা ছিল এমনই। যাইহোক, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের উৎসাহী সবুজ-কর্মীদের দেখেছি কেজো নেতাদের স্বপ্নহীন মুখের দিকে তাকিয়ে হতাশ হয়ে পড়তে। যা চলছিল তারই সঙ্গে অসহায়ভাবে আন্দোলিত হতে। এসব কথা বলবার দরকার হচ্ছে কাউকে নিছক দোষারোপ করবার জন্য নয়। প্রয়োজনে তা করাই যেতে পারে। পরিস্থিতিগত অসহায়তার কথাটাই বোঝা দরকার এখান থেকে। নতুন সরকারের পুরাতনের অনুকরণ করে নিজের ভবিষ্যতের বারোটা বাজানোর শখ হয়েছে বলেই সকলের পক্ষে মঙ্গলময় পরিকল্পনাটির পরীক্ষা-নিরীক্ষা এ হেন বাধার সম্মুখীন হয়েছে তা তো নয়। দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তির মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন হয়ে পড়েছে দল। মনমোহন সিং, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়- কেউই ব্যক্তিগতভাবে একটা অর্থে হয়তো অসৎ নন। এখন, দলকে এখান থেকে উদ্ধার করাই একমাত্র পথ। তার জন্যে চাই দলের পাশাপাশি সমাজের সহাবস্থান সুনিশ্চিত করা। স্বাধীনোত্তর রাজনীতির পর্যবেক্ষণ করে এবং বেশ কিছু দিন ধরে শত দুর্বলতা সত্ত্বেও একটা কাজের চেষ্টা করে আমরা বুঝতে পারছি দলের অবস্থানকে সংকুচিত না করলে ভাবতবর্ষ রসাতলে যাবেই। পৃথিবী জোড়া তিন সমস্যার ধাক্কা ভারতবর্ষের পক্ষে সামলানো সহজ হবে না কিছুতেই। প্রথম কথা অন্য কোনও দেশের অনুসরণে ভারতবর্ষের কৃষিকে পরিবারের হাত থেকে ছিনতাই হতে দেওয়া হবে মহা বিপদের। প্রায় আশি কোটি মানুষের জীবন জীবিকার সঙ্গে কৃষির সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। দুই, পরিবেশ-বিধ্বংসী পরিবহন-সর্বস্বতার দিকেও যেতে দেওয়া যাবে না অর্থনীতিকে। স্থানীয় অর্থনীতির বিচিত্র সম্ভাবনাকে খতিয়ে দেখতেই হবে আজ। উন্নত দেশগুলিতে যখন গ্রিন ইকোনমির নানা সম্ভাবনাকে উদঘাটনের চেষ্টা হচ্ছে তখন আমাদের কোথায় দুর্বলতা, কোথায়ই বা শক্তি তা উদঘাটনই আজকের আশু কর্তব্য। তিন, সেই জন্য দেশের অসংখ্য হাতকে কাজে লাগাবার নিত্যনতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা জারি করতে, দেশের ভালো মানুষদের তথা সব মানুষের ভালো মানসিকতাকে সামাজিক কাজে জায়গা করে নিতে গ্রাসরুটে দলকে নিশ্চিহ্ন করে তুলতেই হবে আজ।

এর জন্য রাজনীতির সর্বস্তরে প্রয়োজনীয় সংস্কারের নিশ্চয়ই দরকার হবে। বিশেষজ্ঞরা তা বিচার করবেন। বিচার করবেন, কোন উপরিতল পরিবর্তন সর্বনিম্নের সমাজকে তার অখন্ডতায় তার সৃষ্টিশীলতায় তার সমৃদ্ধিতে স্থিত করতে পারে। করতে পারে অনন্ত সম্ভাবনায় চল চঞ্চল।

প্রফুল্ল সেনের নির্দলীয় পঞ্চায়েতের কথায় সেদিন অনেকেই হেসেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্যান্য রাজ্যে দলীয় নাম না নিয়ে ভোট হয় বটে, কিন্তু তাও চোরাগোপ্তা দলীয়তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। সে জন্য ব্যবস্থার পরিবর্তনের সময় দেখা চাই, দল ও সমাজের সঠিক সহাবস্থান কোন পদ্ধতিতে ঘটতে পারে সর্বোচ্চ সৌকর্যে। পাশাপাশি সহাবস্থান না ওপরে নিচে? পাশাপাশি সহাবস্থিত হওয়ার মধ্যে বিপদের সম্ভাবনা থাকবেই। দল ত্রিশচল্লিশ লক্ষ বছরের গোষ্ঠীজীবনের স্মৃতির আধারে প্রস্তুত বলেই নতুন যুগের নতুন জল হাওয়া পেয়ে সে এখন তুমুলভাবে দামাল। অতীব আগ্রাসী। বেচারা সমাজকে গিলে ফেলবেই। সেই জন্য ওপরে-নিচে সহাবস্থিত হলেই মঙ্গল। পঞ্চায়েত থেকে ব্লক এমনকি জেলাস্তর পর্যন্ত সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচনের বিধি প্রবর্তিত হওয়াই

বাঞ্ছনীয়। ফিরিয়ে নেওয়ার রাস্তাও খোলা রাখা দরকার। সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিতপ্রতিনিধিদের দ্বারাই বিধানসভা ও লোকসভার প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে পারে দলীয়তার ভিত্তিতে। তাতে দলের সম্ভাব্য শক্তিকে স্বীকার করা হবে, তাকে কাজে লাগানো হবে। কিন্তু তাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়তে দেওয়া হবে না। ভারতের সর্বকালের সেরা মানুষদের দিশা এ পথেই সার্থক হবে বলে বিশ্বাস করি। গান্ধিজি দল ভেঙে দিতে বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন সেই স্বদেশি যুগেই— 'দল করিয়া আমরা বাঁচব না। এক্ষণে আমাদের সমাজপতি চাই।'

সমাজপতি কে? না সকলের মান্যতা পেয়েছেন যিনি। সমাজপতির ভালো মন্দ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কিঞ্চিত আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের পটভূমিতে কথাগুলি বলেছিলেন। আজ বিশ্বের বিধ্বস্ততার বাস্তবতায় ভাবতে হচ্ছে আমাদের। পরিবেশ, কৃষি ও নিযুক্তির তুলনাহীন সংকটের বাস্তবতায়। আজ আমাদের বুঝতেই হবে আমাদের ত্রাণের পথ দল নয়। শেষ বিচারে সমাজও নয়, ব্যক্তিই। ব্যক্ত হয় যে, ব্যক্তি ফাটা তবলা নয়। সকলের মান্যতা ব্যক্তিকে এবং সেই ব্যক্তির মান্যতা সকলকে একটি অপার্থিব সামর্থেই মন্ডিত করে যে! তাই বার বার বলি সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচনের গৌরব একটি ব্যক্তিত্বকে ঘিরে যে বিভূতি বিকশিত করে তোলে, সকলের মঙ্গলের জন্য তার অপার ভূমিকাকে আমাদের একটু একটু করে বুঝে নিতেই হবে আজ। বুঝে নিতেই হবে ব্যক্তির বিবেকের জন্ম ও তার অপার বিকাশ পরিবারের দশজনের মধ্যেই। কিন্তু এক ব্যক্তিকে দশজন ব্যক্তির সঙ্গে জমাটভাবে গোষ্ঠী বা দলভুক্ত করলে, ব্যক্তির বিবেক দশগুণ বেড়ে যাবে না। উল্টোটা হওয়াই স্বাভাবিক। সত্য বটে যে পরিবারের জন্ম বিশ্বকে বরণ করার সাধনপীঠ হিসেবে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, তা আজ, 'গর্তে' পরিণত। পরিবার ও সমাজের চির অস্পষ্ট সীমারেখাতে আজ তাই পাঁচিল পড়েছে গগনচুম্বী। সেই স্বেচ্ছারচিত 'স্বখাত সলিলে' দমবন্ধ দশাতে ভাঙতে ভাঙতে পশ্চিম বিশ্বে পরিবার আজ উধাও প্রায়। পরিবার বিচ্যুত ব্যক্তির একক স্থিতিতেও ভাঙন থেমে নেই। নিজের মধ্যে নিজেই ভাঙছে মানুষ। মানুষকে এই গাড্ডা থেকে উদ্ধারের জন্য বাঞ্ছনীয় প্রলম্বিত পথের সন্ধান জরুরি। আজকের সংকটের নিরসনে প্রথম ধাপ হোক নির্বাচন ব্যবস্থার তৃণমূলে দলীয়তার বিযুক্তি। মানুষকে ধর্মের সঙ্গে গোষ্ঠীর সঙ্গে জাতের সঙ্গে, সর্বোপরি দলের সঙ্গে দমবন্ধ অবস্থায় বেঁধে ফেলবার প্রয়াস দূর। হোক নবীন উদ্যমে জোর পাক ব্যক্তি মানুষের সতত বিস্তারশীল আইডেনটিটির সন্ধান, 'গৃহের সে, বিশ্বের সে, বিশ্ব দেবতার'।

দলের কি কোনো প্রয়োজন আছে?

স্বাধীনতার পূর্বে ভারত ইতিহাসের চূড়া-পুরুষেরা কেউই চাননি ইউরোপ আমেরিকা থেকে ধার করা রাজনৈতিক মডেল দিয়েই দেশ পরিচালিত হোক। রবীন্দ্রনাথ তো প্রচলিত মডেলের স্বাধীনতাও চাননি। বলেছিলেন, 'ওটা স্বাধীনতার উল্টো পথ'। তিনি বলতেন, পরাধীনতা বলতে কেবল পরজাতির অধীনতা বোঝায় না। আত্মীয়ের অধীনতাতেও অধীনতার গ্লানি আছে।' তিনি জানতেন স্বাধীনতার আছে নানা স্তর। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক

এবং আত্মিক। ইংরেজকে তাড়ালেই দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে এমন কোনও সহজিয়া বিশ্বাসে তাঁর সায় ছিল না-যদিও ইংরেজের বিরুদ্ধে একক কণ্ঠের উঁচু আওয়াজটা এদেশে তাঁর মতো করে আর কেউ করতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। সেই জন্য তিনি স্পষ্ট করে লিখেছিলেন, 'ভারতে ইংরেজের আবির্ভাব-নামক ব্যাপারটি বহুরূপী; আজ যে ইংরেজের মূর্তিতে, কাল সে অন্য বিদেশির মূর্তিতে এবং তার পরদিন সে নিজের দেশি লোকের মূর্তিতে নিদারুণ হয়ে দেখা দেবে।' তাঁর বিশ্বাস ছিল, 'এই পরতন্ত্রতাকে ধর্নুবাণ হাতে বাইরে থেকে তাড়া করলে সে আপনার খোলস বদলাতে বদলাতে আমাদের হয়রান করে তুলবে।'

আসলে আর্থিক ও আত্মিক স্বাধীনতার দিকেই ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রধান জোর। একটা ছিল স্বাধীনতার 'ভিত্তি' আর একটা 'ইমারত'। খুব ভুল হবে না এভাবে বলা যে, একটার জন্যে শ্রীনিকেতন, আর একটার জন্যে শান্তিনিকেতন। যদিও শ্রীনিকেতন সৃষ্টির বিস্তর আগেই শুরু করেছিলেন তিনি তাঁর ওই 'ভিত্তি' নির্মানের কাজ এবং লেখালেখি। লিখেছিলেন 'সমবায়' নামের অসাধারন এক প্রবন্ধ। যেখানে প্রস্তাবিত হয়েছে সহযোগিতা ও সম্প্রীতির আধারে আশ্রিত এক সম্ভাবনাময় সমাজের কথা। যেখানে বলেছেন, 'যথেষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতাকে সর্বসাধারণের সম্পদ করে তোলার মূল উপায় হচ্ছে ধন অর্জনে সর্বসাধারণের শক্তিকে সম্মিলিত করা। অনেকে আপন শক্তিকে যখন ধনে পরিণত করতে শিখবে তখনই সর্বমানবের স্বাধীনতার ভিত্তি রচিত হবে। উপরের কথাগুলিকে তলিয়ে অনুধাবন করতে চেষ্টা করলেই উদ্‌ঘাটিত হবে তার সম্ভাবনার সত্যরূপ। 'ধন অর্জনে' 'সর্বসাধারণের' নয়, সংকীর্ণ একটা প্রশিক্ষিত অংশের 'শক্তি' গত ২/৩ শো বছরে বিপুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে কেবলমাত্র শোষণমূলক কাজে, যান্ত্রিকভাবে। তেল-কয়লা-ধাতু ও জলের শোষণ। তাতেই চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বলতা। মাটির নীচের এই প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার ঠিক কবে নিঃশেষিত হয়ে যাবে তার দিনক্ষন তর্কাতীতভাবে নির্দিষ্ট করা যায়নি ঠিকই, কিন্তু ইতিমধ্যে এইটা কতকটা অন্তত বোঝা গেছে যে, এসবের ভান্ডার অফুরন্ত নয়। বিকল্প শক্তি তথা সম্পদের উৎসের সন্ধান তাই অনিবার্য। প্রত্যক্ষ প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বাত্মক সদ্‌ব্যবহারের প্রয়োজনও তাই বেড়েছে তুলনাতীতভাবে। সূর্যালোক ও বৃষ্টির জলের সঙ্গে প্রভূত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ভূপৃষ্ঠের ওপরকার ছ'ইঞ্চি মাটি। রাসায়নিক কৃষি-পদ্ধতিও সন্দেহাতীতভাবে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানসম্মত বলে স্বীকৃতি পাচ্ছে না আর বিকটভাবে প্রকট হচ্ছে তার শোষণবিজ্ঞান-সম্মত রূপ। প্রযুক্তির উত্তরোত্তর উন্নততর উদ্ভাবনের পথকে অবারিত রাখারও পাশাপাশি তৃণমূলে আশ্রিত মানুষের আবহমান অভিজ্ঞতার আধারে 'সর্বসাধারণ'কে আবারও মিলিত করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ইতিহাসের এ এক আশ্চার্য প্রহেলিকা। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, বিশ্বজোড়া মন্দার প্রতিক্রিয়া তথা বাজারবাদের লেলিহ লোলুপতার আগ্রাসিতায় ঐতিহ্যের মধ্য থেকেই জীবনের রস ও রসদের সন্ধানে অনেকটাই আগ্রহ তৈরী হয়েছে বিশ্ব জুড়েই। বিশেষত উন্নত দেশগুলিতে ভারতবর্ষের অবস্থানটা আজ অন্তত কতকগুলি দিক থেকে সুবিধেজনকই ছিল বলা যায়।